স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

৭০ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ৯ এপ্রিল ২০১৮।। ২৫ চৈত্র - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

শিক্ষায় মাতৃভাষা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ২৫ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৯ এপ্রিল - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

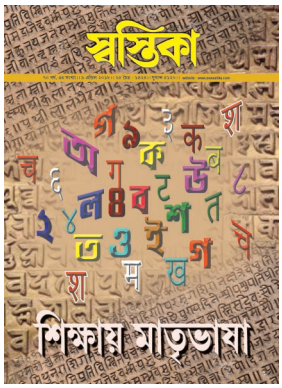

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

খোলা চিঠি : পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল— ভোট হবে ভোটের জন্য ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১০

মমতার জোট-উদ্যোগ নিয়ে বিভ্রান্তি কাটছে না বাম শিবিরে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১১

নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার অবনমন গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয় ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

মালদ্বীপের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে হুমকি স্বরূপ ▯ মানস ঘোষ ▯ ১৪

বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবাদর্শ ও দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্গাতা সৈয়দ আহমেদ খান ▯ পুলকনারায়ণ ধর ▯ ১৭

বাঙালির জন্য বিপন্ন বাংলা ভাষা ▯ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৯

ভারতীয় ভাষাকে গুরুত্ব না দিলে তা হবে আত্মঘাতের শামিল ▯ বিজয় আঢ্য ▯ ২০

'শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত হলো পশ্চিমবঙ্গের আকাশ ▯ ২২

কল্যাণব্রতী মননশীলতাই বুদ্ধিজীবীর ধর্ম ▯ অশোক কুমার চক্রবর্তী ▯ ২৫

হিন্দু জাতীয়তাবাদকে মানতেই যত আপত্তি উদারপন্থীদের ▯ আশুতোষ বার্ষ্ণেয় ▯ ২৭

সিমলা কাঁসারিপাড়ার ঐতিহ্যপূর্ণ গাজন উৎসব ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩১

অনুবাদ সাহিত্যের অনন্যপুরুষ কান্তিচন্দ্র ঘোষ ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ৩২

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত▯ সলিল গেঁউলি ▯ ৩৩

চৈত্র মাসের কৃষিকাজ ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩৫

রামনবমী জনজোয়ার হিন্দু সমাজের অবদমিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ খেলা : ৩৮ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্বাগতম ১৪২৫

বসন্ত প্রায় শেষ হয়ে এল। বৈশাখের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী প্রতিটি মানুষ নতুন বছরকে আহ্বান জানানোর জন্য তৈরি। ঘরে-বাইরে সর্বত্র এখন বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যস্ততা। স্বস্তিকাও প্রস্তুত নতুন বছরের বিশেষ সংখ্যার জন্য। এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকেরা বাঙালির সাহিত্য রাজনীতি পরম্পরা এবং সমাজ সংগঠনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়াও প্রকাশিত হবে বাবাসাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে দুটি বিশেষ রচনা। প্রকাশিতব্য সংখ্যাটির সম্ভাব্য লেখকসূচি : ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, নন্দলাল ভট্টাচার্য, রমেশ পতঙ্গে, সন্দীপ চক্রবর্তী, অর্জুন গোস্বামী প্রমুখ।

দাম একই থাকছে — ১০.০০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

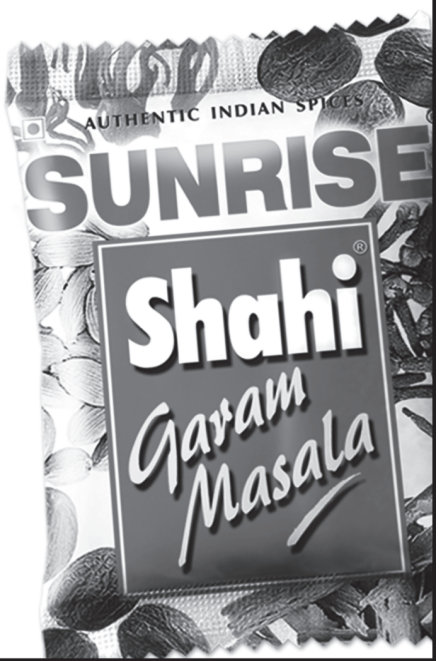

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

তোষণের রাজনীতি

সম্প্রতি রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করিয়া রানিগঞ্জ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। পরদিনই তাহার রেশ ছড়াইয়া পড়ে আসানসোলে। ইহার পর হইতেই গোটা এলাকা দফায় দফায় অশান্ত হইয়া উঠে। 'পাকিস্তান বানিয়ে ছাড়ব'-এর মতো স্লোগানও দেওয়া হয়। একাধিক মানুষ আহত হইয়াছেন, কয়েকজন মারাও গিয়াছেন। ঘরবাড়ি ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রায় তিনশত পরিবার নিরাপত্তার অভাবে এলাকা ছাড়া হইয়াছেন। পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করিবার জন্য রাজ্যের তৃণমূল সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও গত ১ এপ্রিল বিজেপির একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে যায়। এই প্রতিনিধিদলে সাংসদ ওম মাথুর, রূপা গাঙ্গুলি ও দলের রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন ছিলেন। সরকারের তরফে সবরকম বাধা অতিক্রম করিয়া শেষপর্যন্ত প্রতিনিধি দলটি দাঙ্গাগ্রস্ত এলাকায় প্রবেশ করিয়া দাঙ্গাপীড়িত মানুষজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে সমর্থ হন। প্রতিনিধিদলটি ত্রাণশিবিরটিও পরিদর্শন করেন এবং দাঙ্গাপীড়িতদের ত্রাণেরও আশ্বাস দেন। সরেজমিনে তদন্তের পর প্রতিনিধি দলটি এই ঘটনার জন্য রাজ্যের তৃণমূল সরকার ও দলকেই দায়ী করে। তাহাদের অভিযোগ—এই দাঙ্গা পূর্ব-পরিকল্পিত এবং স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর এই ঘটনার মূল পাণ্ডা। এই দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার জন্য এলাকার কয়লা ও বালি মাফিয়াদেরও দায়ী করা হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হইল, স্থানীয় প্রশাসন ও রাজ্যের পুলিশ দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও চেষ্টা করে নাই।

রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠিও আসানসোল ও রানিগঞ্জে অশান্তির জন্য মূলত পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাকেই দায়ী করিয়া কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরাইয়া দেয়। রাজ্যপালের রিপোর্টে সেই ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায়। রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করিয়া আসানসোল রানিগঞ্জে সংঘর্ষ, মৃত্যু ও ঘরছাড়ার মতো ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করিয়াছেন। রিপোর্টে বলা হইয়াছে—এস এস পি পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে একটি টিম উপদ্রুত এলাকায় গিয়া তদন্ত করিবেন এবং আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে কমিশনের কাছে তদন্তের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

গত কয়েক বছর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটিতেছে। রাজ্যে ক্রমশ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আবহ তৈরি হইয়াছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার দেগঙ্গা, বসিরহাট, হাওড়ার ধুলাগড়ের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। রানিগঞ্জ-আসানসোলে ধূলাগড়েরই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। দূরদর্শিতা এবং নেতৃত্বের অভাবের পাশাপাশি সংঘর্ষ যে এত ব্যাপক আকার গ্রহণ করিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পারিবার জন্যই অবস্থা এত ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশ যদি প্রথম হইতেই নিষ্ক্রিয় না থাকিয়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজ করিত, তাহা হইলে এত বড় এলাকা জুড়িয়া অশান্তি ছড়াইত না। রাজনৈতিক মেরুকরণের মাধ্যমে দলীয় ভোটব্যাঙ্ককে স্ফীত করিবার উদ্দেশ্যে শাসকদল সংঘর্ষকারীদের সম্পর্কে যে নরম মনোভাব লইয়াছে ঘটনা পরম্পরাতেই তাহা স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে রাজনীতি চলিতেছে তাহাকে নোংরা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে কোনও মূল্যে ক্ষমতা দখল রাখাই লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রীর তোষণ নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি হইতেছে। এমন সংবেদশীল বিষয় লইয়া রাজনীতি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল দোষী ব্যক্তিদেরই কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ইহার পুনরাবৃত্তি না হয়।

সুভাষিতম্

যোগক্ষেমায় ধর্মস্য সভ্যতায়াঃ সুসংস্কৃতে।
নৈবান্যো বিদ্যতে পন্থা লোকসংঘটনং বিনা।।

ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অর্জন ও রক্ষণের জন্য সমাজ-সংগঠন ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

রামনবমীর শোভাযাত্রায় জেহাদি হামলার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রামনবমীর সমাবেশে শাসকদলের মদতপুষ্ট গুণ্ডাবাহিনী এবং মুসলমান মৌলবাদীদের হামলার ঘটনায় অবিলম্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গের জন্য'। সম্প্রতি রাজ্যপাল শ্রীকেশরীনাথ ত্রিপাঠীর সঙ্গে দেখা করে এবং তার আগে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সংগঠনের পক্ষে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্যকুমার বিশ্বাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকার, শিক্ষাবিদ পুলকনারায়ণ ধর, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, চলচ্চিত্রকার আদিনাথ দাস ও সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত বলেন— রামনবমীর এই হামলার ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শাসকদলের মদতে এই রাজ্যটি যে ক্রমশ মুসলমান মৌলবাদীদের

কবজায় চলে যাচ্ছে এই ঘটনা তার আর একটি প্রমাণ। পাশাপাশি রাজ্যের একশ্রেণীর সংবাদপত্র এবং বুদ্ধিজীবীর ভূমিকারও কড়া নিন্দা করেন এঁরা। বলেন, এই সংবাদপত্র এবং বুদ্ধিজীবীকূল সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মিথ্যা এবং অসত্য প্রচার করছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়, রামনবমীতে অস্ত্র সহকারে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করলে মহরমের ক্ষেত্রেও তা করতে হবে। যেসব তৃণমূল নেতা গত বছর মহরমে এবং এবার রামনবমীতে অস্ত্র হাতে মিছিল করেছেন— তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা প্রশাসন নিয়েছে তা জানাতে হবে। রানিগঞ্জ, আসানসোল এবং অন্যত্র যারা রামনবমীর মিছিলে হামলা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। পরে সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

রামনবমীর শোভাযাত্রা

হামলার প্রতিবাদে সজ্জন সমাজের পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ রামনবমীর শোভাযাত্রার ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট গুণ্ডাবাহিনী এবং জেহাদি মুসলমান মৌলবাদীদের হামলার প্রতিবাদে গত ২ এপ্রিল কলকাতায় এক প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করেছিল নাগরিক মঞ্চ। সমাজের সর্বস্তরের বিশিষ্টজনেরা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীরা এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ধর্মতলার

ওয়াই চ্যানেল থেকে শুরু হয়ে বউবাজারে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তির পাদদেশে এসে মিছিল শেষ হয়। মিছিল শেষের পর একটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ, মোহিত রায় এবং অসীম ঘোষ। বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী তাঁর বক্তব্যে বলেন— 'এই রাজ্যে হিন্দুদের কি ধর্মাচরণের অধিকার থাকবে না? বারবার হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ওপর আঘাত আসছে এই রাজ্যে।' মোহিত রায় বলেন, 'পরিকল্পিতভাবেই এই হামলা চালানো হচ্ছে। ষড়যন্ত্র করে হিন্দুদের ওপর দায় চাপানো হচ্ছে। বাংলার সংবাদমাধ্যমগুলিও একপেশে আচরণ করেছে।' প্রতিবাদ মিছিল থেকে দাবি তোলা হয়, অবিলম্বে রামনবমী শোভাযাত্রার ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। রানিগঞ্জ আসানসোলে যারা খুনখারাপি লুটতরাজ করেছে তাদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।'

আসানসোলে অস্থায়ী শিবিরে নরকযন্ত্রণা, সরকারের মুখে কুলুপ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আসানসোলে রামনবমীর শোভাযাত্রার দিন এবং তারপরের কয়েকদিন ধরে মুসলমান জঙ্গিদের হামলায় চরম ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের নিরাপদ আশ্রয় শিবিরে সরিয়ে নিয়ে গেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই শিবিরের ব্যবস্থা এতটাই জঘন্য যে মনে হতে পারে এটা সম্ভবত জেল পালানো কয়েদিদের রাখার জন্য সরকার তৈরি করেছে। 'এরকম একটি পরিবেশে দেশের নাগরিকদের থাকার ব্যবস্থা কোনও সরকার যে করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাসই হয় না।

দশ বাই ৯ ফুটের একটি ঘরে মোট ৯টি পরিবারের বাস। সেখানেই আপাতত দিন কাটাচ্ছেন বাইশ বছরের সঞ্জু দেবী। সঙ্গে তার স্বামী এবং দশ বছরের একটি বাচ্চা। ৯টি পরিবারের অন্যতম মহেশ তাঁতির পরিবারও। ঘটনার দিন তিনি তার স্ত্রী এবং দুই শিশু সন্তানের সঙ্গে বাড়িতেই ছিলেন। হঠাৎই তার বাড়ির ভেতরে বোমা পড়ে। তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হলেও বাড়িটা বাঁচেনি। তাদের চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এতদিন ধরে তিল তিল করে সাজানো সংসার। তখন তারা মুসলমান জঙ্গিদের হামলায় বিপন্ন কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে আশ্রয় শিবিরে থাকেন। প্রসঙ্গত খুশবু সাউয়ের কথাও বলতে হয়। আঠারো বছরের খুশবু এডিডি বিপিএল কলোনিতে থাকতেন। কলোনির অধিকাংশ বাড়িই পুড়িয়ে দিয়েছে জঙ্গিরা। এখন খুশবু শিবিরের বাসিন্দা। সামনেই তার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে নতুন বইপত্র কিনে দিয়েছেন। কিন্তু এই পরিবেশে পড়াশোনা করা যায় নাকি? খুশবু বলেন, 'কী করে পড়ব! রাতে ভালো করে ঘুমনোর জায়গাটুকুও নেই। তবুও আমি চেষ্টা করছি।'

শিবিরে আশ্রিত আড়াইশো পরিবারের মধ্যে তিনটি পরিবারের কথা তুলে ধরা হলো। এরা যে আশ্রয় শিবিরে (উদ্বাস্তু শিবির বললেও অত্যুক্তি হয় না) রয়েছেন

সেখানে কোনও টয়লেট নেই। জল নেই। একটা মাত্র পাখা। স্থানীয় বাসিন্দারা লঙ্গরখানা খুলেছেন। সেখান থেকে রোজ খাবার আসে। শিবিরের বাসিন্দাদের প্রশ্ন, আমরা যদি মুসলমান হতাম তাহলে কি সরকার আমাদের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করতে পারত?

শিবির হয়েছে নির্মীয়মাণ চারটি বাড়িতে। বাড়িগুলির প্রতিটি ফ্লোরে রয়েছে দুটি করে ঘর। প্রত্যেক ঘরের কোণে ছোট এক চিলতে রান্নাঘর এবং বাথরুমের জায়গা ছেড়ে রাখা হয়েছে। এই বাড়িগুলি নতুন কলোনির বিপিএল প্রকল্পের অন্তর্গত। রান্নাঘর বাথরুম কিছুই এখনও তৈরি হয়নি। নারীপুরুষ শিশু নির্বিশেষে সকলেই খোলা জায়গায় স্নান এবং শৌচকর্ম সারতে বাধ্য হচ্ছেন। স্থানীয় যুবকেরা সারাদিন পাহারায় থাকেন। কিন্তু মহিলাদের নিরাপত্তা ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামনবমীর শোভাযাত্রায় জেহাদি মুসলমানরা নৃশংস হামলা চালায়। রামনবমীর পরের দুদিনও চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলতে থাকে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজন হিন্দুর মৃত্যু হয়েছে। মুসলমানদের অভিযোগ স্থানীয় এক ইমামের ছেলে শিবতুল্লা রশিদির মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনায়। যদিও মুসলমানদের অভিযোগের সারবত্তা ইতিমধ্যেই প্রশ্নের সম্মুখীন। কারণ, সূত্রের খবর, শিবতুল্লা ওই ইমামের ছেলে নয়। সে বাংলাদেশের বাসিন্দা। হিন্দুদের ওপর হামলা করানোর জন্য তাকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল।

শিবিরের অব্যবস্থা নিয়ে প্রশাসনের কেউ মুখ খুলতে রাজি হননি। সম্প্রতি বিজেপির একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল আসানসোলের ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিল। ওখানকার মানুষদের এখন আশাভরসা বিজেপির প্রতিনিধিরাই। তারা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে কিছু করতে পারেন তবেই বাঁচবেন শিবিরের মানুষগুলো। ■

বিউগিল বাজিয়ে কর্ণাটকে বিজেপির ভোটযুদ্ধ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এ বছর কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচন বিজেপির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হতে চলেছে। বিশেষ করে আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে। কিছুদিন আগেই বামপন্থীদের পর্যুদস্ত করে বিজেপি ত্রিপুরায় জয় পেয়েছে। এবার কর্ণাটকেও তারা যদি

জেতে তাহলে নিঃসন্দেহে শতাব্দীপ্রাচীন কংগ্রেস দলের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, বিজেপি কি কর্ণাটকে জিততে পারবে? নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই কর্ণাটকের নির্বাচনী নির্ঘণ্ট জানিয়ে দিয়েছে। ২২৪টি আসন বিশিষ্ট বিধানসভার নির্বাচন হবে ১২ মে। ভোটগণনা এবং ফলাফল ঘোষণা ১৫ মে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হবে ১৮ মে। নির্বাচন কমিশন নির্দেশিকা জারি করবে ১৭ এপ্রিল। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৪ এপ্রিল। ২৭ এপ্রিলের মধ্যে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করা যাবে।

২০০৮ সালে জনপ্রিয় লিঙ্গায়েত নেতা বি.এস ইয়েদ্দুরাপ্পার নেতৃত্বে বিজেপি ১১০টি আসনে জিতে কর্ণাটকে সরকার গঠন করে। কংগ্রেস পেয়েছিল ৮০টি আসন। কিন্তু ২০১৩ সালে কংগ্রেস ১২২টি আসনে জেতে। বিজেপি পেয়েছিল ৪০টি আসন। আবার পটপরিবর্তন হলো ২০১৪ সালে। সেবার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কংগ্রেসকে গোহারান হারায়। বিজেপি ভোট পেয়েছিল ৪৩.৪ শতাংশ।

২০১৪-র পর থেকেই কংগ্রেস ভোটযুদ্ধে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর দেশের যেসব রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে তার প্রায় প্রতিটিতেই কংগ্রেস রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। দেশের অন্যতম প্রধান জাতীয় দল হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কর্ণাটক এখন তাদের শেষ আশা। কিন্তু সিদ্ধারামাইয়ার নেতৃত্বে কংগ্রেস দল এবং সরকার যেসব কাজকর্ম করছে তাতে সেই আশা ক্রমশই দুরাশায় পরিণত হচ্ছে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে সারা দেশে টিকে থাকা একমাত্র দুর্গ রক্ষা করা কংগ্রেসের পক্ষে বেশ কঠিন।

বিজেপির দিক থেকে দেখলে এই নির্বাচনে জেতা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই জয় বিজেপি-শাসিত তিন রাজ্য ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের আসন্ন নির্বাচনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে। প্রভাব ফেলবে উনিশের লোকসভা নির্বাচনেও। সেই কারণে দলীয় নেতৃত্ব কোনও পাথরই উলটে দেখতে ছাড়ছেন না। দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই পাঁচবার কর্ণাটক সফর করেছেন। অমিত শাহও দলীয় সংগঠন ঢেলে সাজিয়েছেন। অন্যদিকে কংগ্রেসের ভরসা শুধু রাহুল গান্ধী। তিনি হিন্দু ভোটের জন্য মন্দির-আশ্রমে যাচ্ছেন। আবার কংগ্রেসের সাবেক ভোটব্যাঙ্ক মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মন জয় করার জন্য মসজিদ বা চার্চে যেতেও ছাড়ছেন না। রাহুল গান্ধীর এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। কর্ণাটকে জেতা ছাড়া তার আর কোনও উপায় নেই। তাকে প্রমাণ করতেই হবে গুজরাট দলের তথাকথিত 'ভালো ফল' নেহাত ফ্লুকে হয়নি। কিংবা শুধুমাত্র স্থানীয় ইস্যু বা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কারণেও হয়নি। প্রমাণ করতে না পারলে কংগ্রেস কর্মীদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে।

কংগ্রেসের প্রধান যুদ্ধনীতি হলো হিন্দু ভোট যথাসম্ভব ভাগ করা। লিঙ্গায়েত বীরশৈব মতবাদকে আলাদা ধর্মের মর্যাদা দেওয়া এই নীতিরই অঙ্গ। সংবিধানের নিষেধ সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া কর্ণাটক রাজ্যের নিজস্ব পতাকা তৈরিতে অনুমোদন দিয়েছেন। যদিও সিদ্ধান্ত দুটি এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। কেন্দ্র তা গ্রহণও করতে পারে, বাতিলও করতে পারে। বস্তুত ক্ষমতায় থাকার জন্য কংগ্রেসের এই বিভাজনের রাজনীতি। সিদ্ধারামাইয়া নিজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর নেতা। তিনি এই সুযোগে জনজাতিদের নিয়ে ভেদাভেদের রাজনীতি শুরু করেছেন। সেই সঙ্গে চলছে অবাধ মুসলমান এবং খ্রিস্টান তোষণ।

অন্যদিকে বিজেপি ২০০৮ সালে ইয়েদ্দুরাপ্পার নেতৃত্বে কর্ণাটকে জিতেছিল। পরে ইয়েদ্দুরাপ্পার সঙ্গে দলের দূরত্ব তৈরি হয়। যার ফল ২০১৩ সালে বিজেপির পরাজয়। যাই হোক, ইয়েদ্দুরাপ্পা নিজের ভুল বুঝে আবার দলে ফিরেছেন। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল জয়ও পেয়েছে। রাজ্য নেতৃত্বের দাবি ইয়েদ্দুরাপ্পার নেতৃত্বে বিজেপি আবার জয়ে ফিরবে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন কর্ণাটকের নির্বাচনে এই তৃতীয় ফ্রন্ট প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের অভিমত কর্ণাটকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও রাজনৈতিক অস্তিত্বই নেই। ফ্রন্টের অন্য নেতাদের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। তাদের অভিমত, ফ্রন্ট হলে তারা কংগ্রেসের ভোটই কাটবে। বিজেপির ভোটব্যাঙ্কে সামান্য আঁচড়ও কাটতে পারবে না। সম্প্রতি কয়েকটি উপনির্বাচনে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্ট মনোভাব দেখা গিয়েছে। কর্ণাটকে সেরকম যাতে না হয় তার জন্য বিউগিল বাজিয়ে ভোটের প্রচার শুরু করেছে বিজেপি। বুঝিয়ে দিয়েছে কর্ণাটক তাদের যুদ্ধক্ষেত্র। সুতরাং কোনওভাবেই এই নির্বাচনকে হালকাভাবে নেওয়া যাবে না।■

এক বছরে দেশে ৭,৪০০ কিলোমিটার রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও মসৃণ করার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া মোট ১৫০টি প্রকল্পের অধীনে ৭,৪০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ১,২২,০০০ কোটি টাকা। সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে গত পাঁচ বছরে গড়ে প্রতি বছর এন এইচ এ আই ২৮৬০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছে। কিন্তু গত অর্থবর্ষে সেই রেকর্ড ভেঙে রাস্তা তৈরি হয়েছে ৭,৪০০ কিলোমিটার। মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'ভারতমালা উদ্যোগের অন্তর্গত ২৩২টি প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল। তাতে মোট ১১,২০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। আনুমানিক খরচ ১,৯৬,০০০ কোটি টাকা। আশা করছি আগামী অর্থবর্ষে (২০১৮-১৯) আমরা আরও ৩০০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে পারব।' এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে সড়ক নির্মাণের পরিমাণ এইরকম : রাজস্থানে ১২৩৪ কিলোমিটার, মহারাষ্ট্রে ৭৩৯ কিলোমিটার, ওড়িশার ৭৪৭ কিলোমিটার, উত্তরপ্রদেশে ৭২৫ কিলোমিটার, তামিলনাড়ুতে ৫১১ কিলোমিটার, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫০৪ কিলোমিটার, কর্ণাটকে ৪৬৮ কিলোমিটার, গুজরাটে ৪৪৯ কিলোমিটার, মধ্যপ্রদেশে ৩৮৯ কিলোমিটার, হরিয়ানায় ৩৩১ কিলোমিটার, বিহারে ২৩২ কিলোমিটার, ঝাড়খণ্ডে ২০১ কিলোমিটার, পশ্চিমবঙ্গে ১২৬ কিলোমিটার এবং পঞ্জাবে ১২০ কিলোমিটার। বাদবাকি সড়ক তৈরি হয়েছে অন্যান্য রাজ্যে।

উবাচ

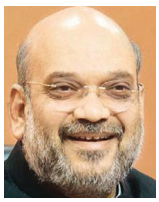

অমিত শাহ
বিজেপির জাতীয় সভাপতি

"২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে বিজেপি ১১টি রাজ্যে কংগ্রেসকে হটিয়েছে। দেশের মানুষ নিজেদের মন ঠিক করে নিয়েছেন, দুর্নীতিগ্রস্ত বর্তমান কর্ণাটক সরকারকেও তাঁরা হটিয়ে দেবেন।"

আসন্ন কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় দাবি করে বক্তব্য

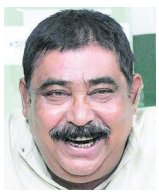

অনুব্রত মণ্ডল
তৃণমূল কংগ্রেস নেতা

"বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দিতে গেলে দেখবেন রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে।"

পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়া প্রসঙ্গে

অরবিন্দ কেজরিওয়াল
মুখ্যমন্ত্রী, দিল্লি

"আপনার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আমার অভিযোগের কারণে আপনার ও আপনার পরিবারের কোনও ক্ষতি হয়ে থাকলে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

অরুণ জেটলির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

"দেশের কয়েকটি রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনা ও এর ফলে কয়েকজন নিহত হওয়ার সংবাদে গভীরভাবে ব্যাথিত। প্রচলিত এস সি/এসটি প্রিভেনসান অব অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্ট বজায় রাখতে কেন্দ্র সরকার সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন জমা দিয়েছে।"

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দলিতদের হিংসাত্মক হওয়ার প্রসঙ্গে

পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল ভোট হবে ভোটের জন্য

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুখ্যমন্ত্রী আপনি সব জানতেন। কিন্তু বুঝতে দেননি। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশের দিন কয়েক আগেই আপনি প্রকাশ্যে বলেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে জুন-জুলাই মাসে। বিরোধীরা সেটা শুনে একটু দম নেওয়ার সুযোগও পায়নি। তার মধ্যেই রাজ্য সরকারের নির্দেশ পেয়ে কমিশন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিয়েছে। সত্যি দিদি যে খেল দেখিয়েছেন না তাতে সব্বার মাথা ঘুরে যাবে।

১ মে শুরু পঞ্চায়েত নির্বাচন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে খুবই কম সময় মিলবে প্রচারের জন্য। বিরোধীদের এমন হা-হুতাশের আগেই প্রচারেও ২৩ গোলে আপনি এবং আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে। মে মাসের শুরুতেই ভোট করার পরিকল্পনা মাথায় রেখেই তো রাজ্যের ২৩ জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকের নামে প্রচার সেরে ফেলেছেন। বিরোধীরা বুঝতেই পারেনি, কিন্তু দিদি আপনার এই একান্ত অনুগত ভাই ঠিক খেয়াল করেছে।

আপনি গত তিন মাস ধরে জেলায় জেলায় ঘুরে প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন। সর্বত্র সরকারি সমাবেশও করেছেন। অনেক প্রকল্পের সূচনা যেমন করেছেন, তেমনই অনেক প্রকল্পের ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সরকারি সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী এটা করতেই পারেন। তাই বিরোধীরা কিছু বলতেই পারেনি। আর সেই সুযোগটা নিয়েই পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিধি লাগু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে আপনার জেলায় জেলায় প্রতিশ্রুতি পর্ব। এত বুদ্ধি শুধু আমার দিদির আছে। এটা আমার গর্ব। কোনও রাজ্যে কেউ এটা করে দেখাতে পারেনি। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও নয়।

সেই সব মিটিংয়ে আপনি সরকারি খরচে বাসে করে লোক এনেছেন। সরকারি খরচে মঞ্চ বেঁধেছেন। পুলিশ সব ব্যবস্থা করেছে। পোষা সাংবাদিকদের এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন যেন তারা সব সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি অফিসার। সরকারের গুণগান করাই তাদের কাজ।

তবুও চিন্তা রয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে। রাজ্যের সর্বত্র এই প্রথমবার লড়াইয়ে বিজেপি। এর আগে সর্বত্র প্রার্থীই দিতে পারেনি বিজেপি। কিন্তু শক্তি যাই থাকুক প্রধান বিরোধী দলের ভাবনা নিয়েই লড়াইয়ের প্রস্তুতি গেরুয়া শিবিরের। সামনেই দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহর কলকাতা সফর। তার আগেই হারজিতের কথা না ভেবেই চাঙ্গা দিলীপ ঘোষরা।

আমি জানি যে, এটা ছাড়া উপায় ছিল না।

সদ্য রাজ্য জুড়ে রামনবমী পালন করেছে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন। রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তী নিয়ে কর্মীরা সক্রিয়। আসানসোলের ঘটনায় খবরের শিরোনামে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসও রামনবমীর মিছিল করেছে। কিন্তু মূলত হিন্দু সংগঠনের উদ্যোগে হওয়া এক হাজারের বেশি মিছিলে মানুষের যোগদান দেখে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অনেকটাই আশ্বস্ত বিজেপি শিবির।

তুমুল মোদী হাওয়ার মধ্যেও ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সাকুল্যে একটি আসন (আসানসোল) জিততে পেরেছিল। দার্জিলিংয়ে বিজেপির সাংসদ হলেও জয় ছিল বিমল গুরুঙ্গদের। এর পরে বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত রাজ্যে প্রথম সাফল্য আসে ২০১৬-তে। রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ-সহ তিনজন জয় পান। এর পরে একের পর এক উপনির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির উপস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছে প্রাপ্ত ভোটের শতাংশে।

ওদিকে কেন্দ্রের নানা প্রকল্প বিজেপির প্রচারের জন্য বড় হাতিয়ার। কিন্তু সেসব হাতিয়ার ব্যবহারের সুযোগই পাবে না বিজেপি। কারণ, প্রচারের সময়টাই তো নেই।

সুতরাং, দিদি আপনি বুদ্ধি-বিবেচনা করেই প্রচার শেষ করে ভোট ঘোষণার ব্যবস্থা করেছেন। আপনার দ্বিতীয় হয় না সত্যিই। এর পরে মনোনয়ন দিতে না দেওয়া, ভোট হতে না দেওয়া, গণনায় গোলমাল এসব অস্ত্র তো আছেই।

তাই দিদি, নিন্দুকেরা যাই বলুক, এই ভাইয়ের তরফ থেকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাফল্যের জন্য আগাম অভিনন্দন রইল। আপনার আগাম প্রচারের মতো আগাম অভিনন্দন।

—**সুন্দর মৌলিক**

মমতার জোট-উদ্যোগ নিয়ে বিভ্রান্তি কাটছে না বাম শিবিরে

দেশের সিপিএম নেতৃত্ব এখন মহা বিপদে পড়েছেন। আর বিপদে ফেলেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পরিকল্পিত বিজেপি-বিরোধী ফেডারেল ফ্রন্টে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন সকল রাজনৈতিক দলকে। সিপিএম আগেই ঘোষণা করেছে যে বিজেপি তাদের প্রধান এবং প্রথম রাজনৈতিক শত্রু। কংগ্রেস দ্বিতীয় শত্রু। একই সঙ্গে দুই রাজনৈতিক শত্রুকে ২০১৯-এর নির্বাচনে মোকাবিলা করার শক্তি মার্কসবাদীদের নেই। তাঁদের জোটবদ্ধ হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও বিকল্প পথ নেই। অথচ মমতার ফেডারেল ফ্রন্ট বা তৃতীয় জোটে কংগ্রেসের সরব উপস্থিতি থাকবে। সমস্যাটা এখানেই। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে যাওয়াটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নির্বাচনী জোট নয়ই, কংগ্রেসের হাত ধরে কোনও সাংগঠনিক কর্মসূচিতেও থাকবে না সিপিএম। সহজ কথায়, সিপিএম নির্বাচনী জোটে যাবে না। তবে পার্টি মমতার 'একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী' নীতিকে মেনে নিয়েছে। যে রাজ্যে বিজেপি-বিরোধী দল শক্তিশালী সেই দলকে বা দলীয় প্রার্থীকে তারা সমর্থন করবে। যেমন, পশ্চিবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরলে সিপিএম প্রার্থী দেবে এবং লড়বে। সমস্যাটা এখানেই। পশ্চিমবঙ্গে তৃমমূল নেত্রী মনে করেন তাঁর দলই বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ। সিপিএম নয়। সেকথা মানতে নারাজ প্রকাশ কারাত অ্যান্ড কোং। সেক্ষেত্রে নিজের রাজ্যেই 'একের বিরুদ্ধে এক' প্রার্থীর নীতি খারিজ হতে বাধ্য। অবশ্যই এই নীতির প্রবক্তা মমতার মুখ পুড়বে।

বিজেপিকে ২০১৯-এর নির্বাচনে কীভাবে ঠেকানো যায় তার দিশা খুঁজে পাচ্ছে না সিপিএম। ত্রিপুরায় ক্ষমতা হারানোর পর সেটা আরও স্পষ্ট। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে গোহারান হারার পর রাজ্য সিপিএম ক্রমশ চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে। জনসমর্থনের

গূঢ় পুরুষের কলম

নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছে বিজেপি। কেরলে বিজেপি এবং আর এস এসকে ঠেকাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে সিপিএমকে। তাই মার্কসবাদীদের হারিয়ে যাওয়া জনসমর্থন ফিরে পেতে তারা বিজেপি এবং কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্য বড় আঞ্চলিক দলের জোটে ঢোকার কৌশল খুঁজছে। সিপিএম নেতৃত্ব জানেন কংগ্রেস দেশের প্রধান বিরোধী দল। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপি-বিরোধী জোট সম্ভব নয়। তাই এখন প্রকাশ কারাত এবং তাঁর কেরল লবি চিন্তা করছেন যে, শর্তসাপেক্ষে জোটে কংগ্রেসের উপস্থিতি মেনে নিতে হবে। না হলে, জাতীয় রাজনীতিতে সিপিএম অ-প্রাসঙ্গিক হতে বাধ্য।

২০১৯-এর নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে দেশের অধিকাংশ আঞ্চলিক দলই জোট গড়তে আগ্রহী। সমস্যা হচ্ছে সেই জোটের প্রধান সেনাপতি হবেন কে? স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস চাইবে রাহুল গান্ধীকে। মমতার তাতে সম্মতি নেই। রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ রাহুল এখনও পর্যন্ত কোনও রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে দলকে জেতাতে পারেননি। রাহুলের উপস্থিতির অর্থ পরাজয়। মমতা চাইছেন সোনিয়া গান্ধী বিজেপি বিরোধী জোটের প্রধান সেনাপতি হন। কিন্তু সোনিয়া সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি যত শীঘ্র সম্ভব রাজনীতি থেকে অসুস্থতার কারণে অবসর চান। তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে জোট রাজনীতিতে নিঃশর্তভাবে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব মানতে হবে। অথবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোটনেত্রী বলে কংগ্রেসকে মেনে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা থেকে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কংগ্রেস এবং সিপিএম সমর্থকরা বাধ্য হবেন তৃণমূলকে হারাতে বিজেপি প্রার্থীদের ভোট দিতে। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হবেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। তাতে লাভ বিজেপির। মমতা অবশ্যই চাইবেন না বিজেপিকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিতে। এ যেন শাঁখের করাত। আসতেও কাটে, আবার যেতেও কাটে।

বিজেপি বিরোধী জোট নিয়ে বিভ্রান্তি কাটছে না। বামপন্থী দল সিপিআই এবং সিপিএম ঘোষণা করেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে তারা জোটে নেই। কারণ সেখানে কংগ্রেস ও তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ বামেরা। সিপিআইকে কৌশল পার্টি বলা হয়। সিপিআই চাইছে ভারতের যে সব রাজ্যে বামদলেরা দুর্বল সেখানে 'একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী' দেওয়া হোক। শুধু পশ্চিমবঙ্গ, কেরলে এই নীতি চলবে না। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে কুস্তি আর দিল্লিতে দোস্তি। এমন সুবিধাবাদী নীতি নিয়ে জোট গড়লে তার পরিণতি বিয়োগান্তক হতে বাধ্য। ■

নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার অবনমন গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়

ড. নির্মালেন্দু বিকাশ রক্ষিত

আমি একটা ইংরেজি ও চারটে বাংলা পত্রিকা রাখি। বাংলা পত্রিকাগুলো পড়তে মিনিট পাঁচেক লাগে, কারণ এগুলোতে পড়ার মতো কিছু থাকে না।

আগে জানতাম সংবাদপত্রের কাজ হলো সংবাদ পরিবেশন করা। কিন্তু এখন মনে হয়, এই সব পত্রিকা পাঠক-পাঠিকাকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে চায়। সাংবাদিকরা এখন শিক্ষাগুরু। অবশ্য কোনও কোনও রাজনৈতিক দলেরই মুখপত্র রয়েছে— সেগুলোতে কী লেখা থাকবে, সেটা আমরা জানি। কিন্তু এখন কিছু দৈনিক পত্রিকা আছে সেগুলো কোনও-না-কোনও দলের হয়ে সংবাদ প্রকাশ করে অথবা জনমত তৈরি করার দায়িত্ব পালন করে।

এটা ঠিক যে, অনেক পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের বিশেষ ধরনের পক্ষপাতিত্ব থাকে। তার ওপর সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত মত ও ধারণারও ব্যাপার আছে। অনেক সময় বিভাগীয় সম্পাদকও বিষয় ও বক্তব্য ঠিক করে দেন। এটাও লক্ষণীয় যে, সাম্প্রতিককালে কোনও কোনও সম্পাদককে সরানো হয়েছে, কেউ কেউ দীর্ঘদিনের অমূল্য অবদানের পরেও সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির লোভ বা বিশেষ নেতা-নেত্রীর কৃপা লাভ।

অনেক ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগ করা হয় অর্থটা জানার আগেই। যেমন 'মেরুকরণ'। বিজেপি নাকি রাজনীতিতে মেরুকরণ করে চলেছে। মেরুকরণ তো হলো দুইভাগে বিভক্ত করা। কিন্তু বিজেপির দিকে যেমন কয়েকটা দল বা সংগঠন আছে, অন্যদিকে ইউ পি এ-র দিকেও আছে অনেকে। আবার কয়েকশো দল আছে মাঝখানে। নির্বাচন কমিশনের হিসেবে এখন দেশে উনিশশো রাজনৈতিক দল আছে— তাদের ঠিক দু'ভাগে ভাগ করা যায়?

আরেকটা শব্দ 'গৈরিকীকরণ'। এটা তো সহজ ব্যাপার। কারণ গৈরিক রঙ পবিত্রতা ও সততার প্রতীক। সন্ন্যাসীর বসন তাই গৈরিক। সাংবাদিক বোধহয় বলতে চান বিজেপি তার তত্ত্ব প্রচার করছে। কিন্তু ওই দল এখন দেশের ২৯টা রাজ্যের মধ্যে ২২-টাতেই শাসন-ক্ষমতায় আছে। কিন্তু কোথায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তার রাজনৈতিক তত্ত্ব পাঠ্যসূচিতে ঢুকিয়েছে? বাম-জমানার মতো কি শিক্ষক উপাচার্যদের রঙ দেখে নিয়োগ করেছে? মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য এখনও দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করতে পেয়েছে?

আরও বড় ভ্রান্তি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটার প্রয়োগে। কোনও কোনও পত্রিকা উপদেশ দেয়— ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর একত্রিত হওয়া উচিত বিজেপির বিরুদ্ধে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো— 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কোন জিনিস? তবে ধর্মকে কাজে লাগায় কোন দল? একবার এক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতার ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে 'হিন্দুত্বের' বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে'।

'চিঠিপত্র' বিভাগের জন্য লিখেছিলাম— ওই দুটো শব্দের অর্থ সম্পাদক জানেন কিনা। বলা বাহুল্য, চিঠিটা মুদ্রিত হয়নি। এঁদের অনেকেই 'ধর্ম' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দদুটোর অর্থই জানেন না। আমরা 'ধর্ম' কথাটা এনেছি 'রিলিজিয়ন থেকে, অথচ দুটো আলাদা জিনিস। প্রাচীন ভারতে 'ধর্ম' বলতে যা বোঝানো হতো, সেটা হলো 'Dharma'— 'religion' নয়। শব্দটা এসেছে 'ধৃ' ধাতু থেকে, যা আমাদের ধরে রাখে, স্খলন-পতন থেকে রক্ষা করে, সেটাই হলো 'ধর্ম'। তার দ্বারা বোঝায় সততা, ন্যায়, আদর্শবোধ, বিবেক, সত্য, কর্তব্য ইত্যাদি। ডি. ম্যাকেঞ্জি ব্রাউনের মতে, 'the term is employed in many senses, scientific and common-duty, virtue, religions creed, justice, law'— (দ্য হোয়াইট আমব্রেলা, পৃ. ১৫)।

সুতরাং 'ধর্ম' সম্বন্ধে নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত বা উদাসীন হওয়া যায় না— ধর্মই আমাদের জীবন-বেদ। এখানে ঈশ্বরে ভক্তি বা বিশ্বাস, মন্ত্র পড়া, জপ করাটা বড় কিছু নয়— আসল কথাটা সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্য পালন ও স্বচ্ছতা। 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম' কথাটার অর্থ কী? মহাগ্রন্থ 'গীতা' শুরু হয়েছে 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' কথাগুলো দিয়ে। কিন্তু সেখানে পুজো হয়নি--- ঘণ্টাধ্বনি বাজেনি--- হয়েছে মহাযুদ্ধ, ন্যায় ও অন্যায়ের রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি যুগে যুগে আসবেন 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' অর্থাৎ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

তাহলে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ হব?

আর এই বাংলা শব্দটা 'সেকুলারিজম্'-এর মারাত্মক অনুবাদ। ইংরেজি 'Secular' কথাটা এসেছে একেবারে অন্য ভাবে। মধ্যযুগের ইউরোপে দীর্ঘদিন দ্বন্দ্ব চলেছিল পোপ এবং রাজাদের সঙ্গে। বিভিন্ন রাজা ছিলেন নির্দিষ্ট দেশের শাসকপ্রধান, কিন্তু পোপ ছিলেন সমগ্র খ্রিস্টান জগতের অধীশ্বর। তিনি ও অন্য যাজকরা ধর্ম জগৎ তো বটেই, রাজনৈতিক জীবনও নিয়ন্ত্রিত করেন। সামন্ততন্ত্রের মতোই 'the church had been a veritable challange to the crown'— (ড. কে. সি. চৌধুরী, ব্রিটিশ হিস্ট্রি, পৃ. ৭)।

পোপের ক্ষমতা ছিল না— কিন্তু মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে তিনি ঈশ্বরের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। এইচ. জি. ওয়েলসের ভাষায়, 'he held the keys of heaven and hell'— (এ শর্ট হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃ. ১৭৮)। মার্টিন লুথার, ক্যালভিন, অষ্টম হেনরি প্রমুখ ব্যক্তির বিশ্বাসের ফলে শেষ পর্যন্ত এই দ্বৈত-ব্যবস্থার ('doctrine of two swords') অবসান ঘটে এবং রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জন্ম হয় সেকুলার রাষ্ট্রের। এর অর্থ চার্চের কাজ ধর্ম নিয়ে থাকা, রাজার কাজ রাজ্য শাসন। সুতরাং আমাদের অধিকাংশ নেতা ও সাংবাদিক সেকুলার শব্দটির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন— শব্দটা আসলে অর্থহীন ও বিভ্রান্তিমূলক (ড. ঊষারঞ্জন চক্রবর্তী--- প্রসঙ্গ গণতন্ত্র, রাজনীতি ও ধর্ম, পৃ. ৩৩)। আসলে, 'সেকুলার স্টেট' হলো সেই দেশ যেখানে সরকার কোনও ধর্মকেই বিশেষ সুযোগ দেয় না বা বিদ্বেষের চোখে দেখে না। কিন্তু তার দ্বারা হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করা বোঝায় না। বিশেষ করে, সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, হিন্দুত্ব অপরাধমূলক কিছু নয়— এটা একটা ধর্ম এবং 'a way of life।' এর দ্বারা একটা জীবনধারা ও জাতি বোঝায়।

অবশ্য এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে মনে হয় 'সেকুলার' কথাটা অন্য ধরনের। এস এল সিক্রি মন্তব্য করেছেন, 'By and large, a Hindu is to-day accepted as secular only if he is pro-Muslim and perhaps, pro-other minorities' He is lauded us genuinly secular if he is also critical of Hinduism'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৯৩)। কথাটা এসেছে ইউরোপের রাজা চার্চের দ্বন্দ্ব থেকে— 'a long conflict between the two took place'— (ড. কে চৌধুরী— লিভিং হিস্ট্রি, ২য় ভাগ, পৃ. ৪২)। সেটাকে এখন 'প্রগতিশীলরা' হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে ধরে নিয়েছেন। আরেকটা প্রশ্ন— ধর্মনিরপেক্ষ দল কোনটা?

বিজেপি হিন্দুত্বের কথা বলেছে— কিন্তু কোনও মুসলমান বা খ্রিস্টানকে তাড়ায়নি, ধর্মান্তরকরণের কর্মসূচি নেয়নি, কোনও ধর্মমতকেও চাপিয়েও দেয়নি। কিন্তু কিছু সংবাদপত্র রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। একটা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশায় তিনটে কেন্দ্রে ওই দলের হারের কথা লেখা হয়েছে, কিন্তু গুজরাটে তার আসন কমলেও কংগ্রেসকে (৭৭) পরাজিত করে ৯৯টা আসন দখল করে সরকার গঠন করেছে— এটা নাকি তার 'নৈতিক পরাজয়!' নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পার্থক্যটা কম নয়— ২২টা আসনের, তবু এটা তার লজ্জাজনক হার? ত্রিপুরায় পঁচিশ বছরের বাম রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করেছে। ফলাফল ৪৭/১৬। তাতে অনেক সাংবাদিক যেন শোকাচ্ছন্ন হয়ে খবরটা ছেপেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্য দুটো রাজ্য নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের বিজেপি সম্প্রতি সরকারের শরিক হয়েছে। মেঘালয়ে এই দল পেয়েছে মাত্র ২টো আসন। কিন্তু পাঁচটা দল একত্রিত হয়ে (৩৪) সরকার গঠন করেছে— বিজেপিও তাতে আছে। বৃহত্তম দল হয়েও (২১) কংগ্রেস সুযোগটা পায়নি বলে একটা পত্রিকার কী দুঃখ! সাংবাদিক লিখেছেন— 'বিজেপির কূটচালে কংগ্রেস বঞ্চিত হয়েছে'। কংগ্রেস যদি সঙ্গী জোটাতে না পারে, সেটা বিজেপির কূটচাল হয়ে গেল? মনে রাখতে হবে— তাদের একটাকে (ইউডিপি) আগেরবার কংগ্রেস জোটে এনে সরকার গড়লেও এক বছরের মধ্যেই জোট ভেঙে একক সরকার গঠন করেছিল। তারা আবার বেলতলায় যাবে?

এই সাংবাদিকরা জানে না যে, ১৯৮২ সালে প্রথম আবির্ভাবের সময় লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মাত্র দুটো আসন পেয়েছিল। সেই দলই ইতিমধ্যে কেন্দ্রে চারবার ক্ষমতায় এসেছে এবং ২৯ টার মধ্যে ২২টা রাজ্যে সরকার গঠন করেছে। দুই মাস আগে তারা হিমাচল প্রদেশ কংগ্রেসের কাছ থেকে নিয়েছে এবং সাম্প্রতিক কালে কংগ্রেস মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, অসম ও মণিপুরেও পিছু হটেছে।

এই অবস্থায় এই সব সাংবাদিকদের উচিত অন্ধ বিদ্বেষ ত্যাগ করে অনুসন্ধান করা রহস্যটা কোথায় লুকিয়ে আছে? বিজেপির এই উত্থানের চাবিকাঠিটা আছে কোথায়?

১৯৯২ সালে উত্তরপ্রদেশে রামমন্দিরের বাবরি ধাঁচা ভাঙা হয়েছিল। জ্যোতিবাবু বলেছিলেন— ওটা অসভ্য দল, মসজিদ ভাঙে। বহু পত্রিকায় লিখেছিলাম— ওটা আদতে কিন্তু ছিল রামমন্দির। বাদশা বাবর সেনাপতি বাকি খাঁ-কে দিয়ে তার ওপরের অংশ ভেঙে মসজিদের রূপ দিয়েছেন বলে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মাখনলাল রায় চৌধুরী, ড. কে এস লাল প্রমুখ বরেণ্য ঐতিহাসিকরা জানিয়েছেন। কিন্তু এখনও অনেক পত্রিকা মসজিদ ভাঙার নিন্দা করে। 'ইন্ডিয়ান আর্কাইভস্' জানিয়েছে— এই পর্যন্ত সারা দেশে ৭০০০-এর বেশি মন্দির ভাঙা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে পত্রিকাগুলো নীরব।

গোধরায় ৫৯ জন করসেবককে ট্রেনের কামরা বন্ধ করে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে— সংবাদপত্র কিন্তু উচ্চবাচ্য করেনি। কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতরা বিতাড়িত হয়ে দিল্লি ও জম্মুতে তাঁবুতে থাকছে—কে লেখে তাঁদের কথা?

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার বিপিনচন্দ্র পাল অরবিন্দ ঘোষের (পরে শ্রীঅরবিন্দ) লেখার জন্য নিজে জেল খেটেছেন, কিন্তু লেখকের নাম বলেননি আদালতে। কার্জনের 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' অনুসারে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সব পত্রপত্রিকা সেন্সর হবে জেনে হঠাৎ 'অমৃতবাজার'কে ইংরেজি করা হয়েছিল। সম্পাদক মতিলাল ঘোষ বড়লাট কার্জনের মিথ্যাচার নিয়ে স্যার গুরুদাস ব্যানার্জির লেখা ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে নিয়ে 'সম্পাদকীয়' হিসেবে ছাপিয়েছিলেন— জেল খাটা নিয়ে ভয় পাননি। পত্রপত্রিকা তখন নির্ভীকভাবে ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে 'accelerated the growth of national consciousness'— (ড. নিমাইসাধন বসু— দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, পৃ. ৪)। সেই সব দিন কোথায় গেল? ■

মালদ্বীপের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে হুমকি স্বরূপ

মালদ্বীপ যে চীনের কথায় ওঠে বসে তার অতি সাম্প্রতিক প্রমাণ হলো ভারত মহাসাগরে আন্তর্দেশীয় এক নৌমহড়ায় অংশগ্রহণের জন্য ভারতের আমন্ত্রকে প্রত্যাখান করা। চীন চাইছে দ্বীপরাষ্ট্রটি ভারতের মতোই সব সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুমাত্র বেজিংয়ের ওপর নির্ভরশীল হোক।

মানস ঘোষ

দু'বছর আগে আরব সাগরে অবস্থিত ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপে প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ নাশিদকে যখন এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, তখনই শুধু মালদ্বীপবাসীর মনে নয়, ভারতের নীতি নির্ধারকদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। কারণ রাষ্ট্রপতি নাশিদ এমন কিছু গর্হিত বা অগণতান্ত্রিক কাজ করেননি যার জন্য পুলিশ বাহিনীতে বিদ্রোহ হতে পারে। এর সুযোগ নিয়ে চীন, পাকিস্তান ও সৌদি আরবপন্থী বিরোধী দলের লোকেরা রাস্তায় নেমে সেই বিদ্রোহকে সমর্থন করে দেশের রাজপাট বদল করে দেয়।

নাশিদের ভারতপ্রীতি এই মুসলমান প্রধান দেশের বিরোধী রাজনীকিদের একেবারেই অপসন্দ ছিল। এর জন্য নাশিদ তাদের অনেকেরই চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। পরে বোঝা যায় চীন ও তার দলদাস প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, সৌদি আরব নেপথ্যে থেকে যৌথভাবে ওই অভ্যুত্থানের কলকাঠি নেড়েছিল। লক্ষ্য ছিল ভারতকে বেকায়দায় ফেলে এই অতীব সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপরাষ্ট্রটিকে ভারতের প্রভাব-বলয় থেকে মুক্ত করা। মালদ্বীপের গা ঘেঁষে আছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত নৌচলাচলের প্রধান নৌপথ। এই দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে বিশাল তৈলবাহী জাহাজ চীন, জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জ্বালানির জোগান এই নৌপথ দিয়েই নিয়ে যায়। চীনের ভয় যদি কোনওদিন এই সামুদ্রিক নৌপথ অবরোধের সম্মুখীন হয় তাহলে চীনের অর্থনীতি রাতারাতি মুখ থুবড়ে পড়বে।

সেই কারণে এই দ্বীপটির ওপর চীনের শ্যেন দৃষ্টি বেশ কয়েক যুগ ধরে। সেই জন্য ১৯৮৮-তে মালদ্বীপের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি মাউমুন আব্দুল গায়ুম ভারতের তখন কার প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে একটি এসওএস বার্তা পাঠিয়ে তাঁকে ও তাঁর সরকারকে বিদেশি ভাড়াটিয়া সেন্যদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভারতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। এমনকী সশস্ত্র ভারতীয় সেনা পাঠানোর জন্য অনুরোধ পর্যন্ত করেন। মালদ্বীপ সরকারের এই ভূমিকা চীন ভালো চোখে দেখেনি।

রাজীব ওই বার্তা পেয়েই একদিনের মধ্যে আগ্রার সামরিক ছাউনি থেকে ভারতের বিশেষ ছত্রী বাহিনীকে বিমান বাহিনীর বিশাল মালবাদী বিমান 'গজরাজ'-এ করে মালদ্বীপে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে যায় নৌবাহিনীর দু'খানা যুদ্ধ জাহাজ। দিন চারেকের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী সেখানকার ভাড়াটিয়া বাহিনী এবং বিদেশে বসবাসরত এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, যে দ্বীপরাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করার জন্য প্রচুর বিদেশি টাকা ঢেলেছিল, তাদের গ্রেপ্তার করে মালদ্বীপ সরকারের হাতে তুলে দেয়। অবস্থা স্বাভাবিক হলে ভারতীয় বাহিনী স্বদেশে ফিরে আসে।

ভারতের এই সদর্থক ভূমিকায় যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন স্বয়ং রাজীব গান্ধীকে অভিনন্দিত করে বার্তা পাঠান, যাতে তিনি লেখেন ভারত যদি উপকূলবর্তী দেশগুলোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখে তাহলে ওই অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে। রেগনের এই বার্তায় চীন ও পাকিস্তান খুবই ক্ষুব্ধ হয়। তাহলে কি ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলো ভারতের প্রভাব-বলয়েই থেকে যাবে? তখন থেকেই চীন মালদ্বীপকে ভারতের প্রভাব থেকে মুক্ত করে নিজের তাঁবেদারে পরিণত করতে তৎপর হয়। একের পর এক ছক কষে চলে। প্রথম ছকটি ছিল রাষ্ট্রপতি নাশিদকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজের বশংবদ রাজনীতিক ইয়ামিন গইয়ুমকে ক্ষমতায় আনা। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে চীন কোনও কিছুরই খামতি রাখেনি। মালদ্বীপের সেনাবাহিনী, পুলিশ, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, প্রশাসনিক আমলা, এমনকী বিচার বিভাগের বিচারপতিদেরও নানা প্রলোভন ও উপঢৌকন দিয়ে চীনপন্থী লবি তৈরি করতে সফল হয়। যার মূল লক্ষ্য ছিল যে-কোনও মূল্যে নাশিদকে ক্ষমতার বাইরে রেখে ইয়ামিনকে ক্ষমতায়

মালে সরকার বিরোধী মিছিল।

আনা। নাশিদকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ১৩ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

দেশের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মিথ্যাচারে ভরা অভিসন্ধিমূলক অভিযোগ এবং দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী সোচ্চার হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ ও নামিদামি মানবাধিকার সংস্থা প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। তারা একবাক্যে বলে দণ্ডাদেশটি দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে, যাতে নাশিদ ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন। দণ্ডাদেশের অন্য লক্ষ্য ছিল নাশিদকে রাজনৈতিক নির্বাচনে চলে যেতে বাধ্য করা। এর পরেই ২০১৩ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইয়ামিন পুলিশ প্রসাসন ও সুন্নি মৌলবাদী সংগঠনের সাহায্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন।

নাশিদকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর চীন দ্বীপরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে খোলাখুলি নাক গলাতে শুরু করে। সেই থেকে মালদ্বীপে চীনের খবরদারি শুরু। নাশিদকে দেশছাড়া করার লক্ষ্যে চিকিৎসার অজুহাত দেখিয়ে যুক্তরাজ্যে পাঠানো হয়। কিন্তু নাশিদ যুক্তরাজ্যে না থেকে শ্রীলঙ্কায় চলে আসেন। কলোম্বোয় তাঁর দল Maldives Progressive Party-র ঘাঁটি গাড়েন। তিনি বেশ কয়েকবার দেশে ফেরার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে মালে বিমানবন্দরে পা ফেলার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। কারণ রাষ্ট্রপতি ইয়ামিন নাশিদের জনপ্রিয়তাকে খুবই ভয় পান।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই ইয়ামিন দ্বীপরাষ্ট্রটিকে ভারতীয় প্রভাব-বলয় থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে একের পর এক সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে মালেতে একটি পুরোদস্তুর চীনা দূতাবাস খোলার অনুমতি দেন। পাকিস্তান ও সৌদি আরবকে তাদের দূতাবাসের কলেবর বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেন। মালে বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ যে কাজ এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা তিনি কোনও কারণ না দেখিয়ে বাতিল করেন। কাজটি এক চীনা সরকারি কোম্পানিকে দেওয়া হয়। ভারত সরকারের তীব্র আপত্তিকে তিনি কোনও পাত্তাই দেননি। এরপর চীনা যাত্রীবাহী বিমান শয়ে শয়ে চীনা পর্যটকদের নিয়ে মালে বিমানবন্দরে ঘন ঘন অবতরণ করতে শুরু করে। সঙ্গে আসে চীনের যুদ্ধজাহাজ যা দ্বীপে এবং দ্বীপের অদূরে নোঙর ফেলে।

মালদ্বীপের দ্বীপগুলোকে এক সূত্রে গাঁথার লক্ষ্যে চীন বিশাল ভাবে সেই নির্মাণের বরাত পায়। নিজের পয়সা খরচ করে দ্বীপরাষ্ট্রের অবকাঠামো গড়ার কাজে বিশাল ভাবে হাত দেয়, যা চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী কর্মসূচির অন্তর্গত। কোনও রাখঢাক না রেখেই বেজিং ঘোষণা করেছে মালদ্বীপে চীন একটি জয়েন্ট ওশন অবজারভেশন স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। সমুদ্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্টেশনটি যে সামরিক কর্মসূচিও চালাবে তা বলাবাহুল্য। সঙ্গে থাকবে একটি সাবমেরিন বেস। যে দ্বীপে এই স্টেশনটি স্থাপিত হবে সেখান থেকে ভারতীয় উপকূল খুব কাছেই। স্টেশনটি স্থাপিত হলে ভারত মহাসাগরে নৌচলাচলের গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক রুটের ওপর তীক্ষ্ণ নজরদারি চালানো অনেকটাই সহজ হবে চীনের পক্ষে। গত বছর দক্ষিণ চীন সাগরে একই ধরনের স্টেশন স্থাপন করে বেজিং। স্টেশনটি স্থাপনের মাধ্যমে আমেরিকা- জাপান সহ গোটা দুনিয়াকে দক্ষিণ চীন সাগরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণের কথা ঘোষণা করে চীন।

বেজিং প্রেসিডেন্ট ইয়ামিনের সরকারকে এতটাই বশংবদে পরিণত করে নিজের কবজায় নিয়েছে যে, চীনের নির্দেশ ছাড়া মালের বর্তমান সরকার একটিও সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। চীন চায় না মালদ্বীপে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক। দ্বীপ রাষ্ট্রটিতে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাতে কোনোভাবে না হয় সে ব্যাপারে বেজিং বদ্ধপরিকর। দ্বীপরাষ্ট্রে যাতে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন না ঘটে তার জন্য সবরকম অভ্যন্তরীণ চেষ্টা চীন ইয়ামিনকে দিয়ে ভেস্তে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে দেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি মহম্মদ জামিল আহমেদের বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক— ''গণতন্ত্র ফেরানোর যতরকম পথ ছিল, সবরকম ভাবেই চেষ্টা করেছে মালদ্বীপের মানুষ। বিচার বিভাগ তার রায় দিয়েছে। জাতীয় সংসদ মিটমাটের চেষ্টা করেছে। সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানও চেষ্টা করেছে মালদ্বীপে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র ফেরাতে। কিন্তু সবাই ব্যর্থ''।

মালদ্বীপে রাজনৈতিক সংকটের সূত্রপাত গত ফেব্রুয়ারির শুরু তে। দেশে উচ্চ আদালত এক রায়ে ইয়ামিনের দলের ১২ জন দলছুট সাংসদ যারা নাশিদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য মজলিশের (সংসদ) সদস্যপদ খুঁইয়েছিল, তারা

চীনের সঙ্গে যুঝতে হলে ভারতকে তার নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। মালদ্বীপে সেনা হস্তক্ষেপের বদলে গণতন্ত্র ও উদারনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতকে জোর সওয়াল করতে হবে। কারণ মালদ্বীপবাসীদেরও লক্ষ্য এক।

তাদের সদস্যপদ ফিরে পায়। সে কারণে ইয়ামিনের দল মজলিশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। ইয়ামিন প্রমাদ গোনেন। তিনি ও চীন বুঝতে পারেন জনপ্রিয় নাশিদের সঙ্গে এঁটে ওঠা খুবই দুরূহ। ফলে তাঁর পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। ইয়ামিন গণতন্ত্রকে নির্বাসিত করে স্বেচ্ছাচারের পথে হাঁটতে শুরু করেন। প্রথমে তিনি দেশে ১৫ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি, অন্য এক বিচারপতি এবং বিরোধী শিবিরে থাকা রাজনৈতিক নেতাদের জেলে পোরেন। তিনি তাঁর সৎ ভাই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মাউমুন গাইয়ুমকেও গ্রেপ্তার করতে পিছুপা হননি। ইয়ামিন যে কতটা স্বেচ্ছাচারী তা বোঝা যায় যখন তিনি তিন বিচারপতিকে মুক্ত রেখে তাঁদের দিয়ে ইয়ামিন বিরোধী সাংসদ, যাদের শাস্তি মুকুব করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা রদ করে তাঁদের আবার জেলে পোরেন। জরুরি অবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধির ডিক্রিকে সাংসদদের দিয়ে অনুমোদনের সিলমোহর লাগান। ডিক্রি অনুমোদনের জন্য মজলিশের ৪৩ সাংসদের উপস্থিতি একান্ত জরুরি ছিল। যেহেতু বিরোধী সাংসদদের তিনি বন্দি করে রেখেছেন ফলে মজলিশের 'কোরাম' হচ্ছিল না। ডিক্রিটিকে নির্বিঘ্নে পাশ করাবার জন্য এক আদেশবলে তিনি মজলিশের আসন সংখ্যা ৮৫ থেকে ৭৩-এ নামিয়ে আনেন, যাতে তাঁর দলের ৩৮ সাংসদের উপস্থিতি ও অনুমোদন ওই কাজের জন্য যথেষ্ট হয়।

এই ডিক্রি জারির পর শ্রীলঙ্কায় নির্বাসিত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নাশিদ ১৯৮৮-এর মতো দ্বীপরাষ্ট্রে ভারতের হস্তক্ষেপের প্রার্থনা করেন। দিল্লি যাতে মালদ্বীপে অবিলম্বে সেনা পাঠিয়ে বর্তমান অবৈধ সরকারকে উৎখাত করে সেই মর্মে অনুরোধ জানান। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি মহম্মদ জামিলও বলেন, দেশে গণতন্ত্র ফেরানোর প্রচেষ্টায় ভারতের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। আর তখনই শুরু হয় ভারতের প্রতি চীনের হুমকি ধমকি— 'ভারত মালদ্বীপের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যদি হস্তক্ষেপ করে তবে তার ফল ভালো হবে না।' আর ভারতকে সতর্ক করতেই ভারত মহাসাগরে এক বিশাল নৌবহর পাঠায় চীন। কিন্তু নাশিদও দমার পাত্র নন। চীনের হুমকির জবাবে তিনি বলেন ভারতীয় সেনা ১৯৮৮ সালে দ্বীপরাষ্ট্রে মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, নিপীড়ক হিসেবে নয়। বাংলাদেশেও ভারতের একই ভূমিকা ছিল।

কিন্তু ইয়ামিন, চীন ও পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে মালদ্বীপবাসীরা ক্রমশ প্রতিবাদী হচ্ছে। ইয়ামিন পাকিস্তানের কট্টর মৌলবাদী সংগঠনের শাখা তার দেশে খুলতে দিয়েছেন। দ্বীপের বহু যুবক আই এস-এর হয়ে লড়াই করতে সিরিয়ায় গেছে। ইতিমধ্যে দেশে যে ডামাডোলের রাজনীতি চলছে তাতে দ্বীপবাসীরা তিতিবিরক্ত হয়ে জরুরি অবস্থার সব বিধিনিষেধ ভেঙে বিশাল সরকার বিরোধী জমায়েতের আয়োজন করছে। গত ১৭ ও ১৮ মার্চ দ্বীপের রাজধানী মালের প্রধান সরকারি অফিসপাড়ায় কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ, বিরোধী সাংসদরা সরকার-বিরোধী মিছিল বার করে এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করতে সেনা ও পুলিশ বাহিনীকে কাঁদানে গ্যাস ও পেপার স্প্রে ছড়াতে হয়। ওই মিছিলে প্রচুর মহিলা ও ছাত্র শামিল হয়েছিল। সেনা ও পুলিশবাহিনী জানায় তারা ১৪০ জন মহিলা ও যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। দেশের প্রধান প্রসিকিউটার জেনারেল অইশথ বিশম জরুরি অবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে 'অসংবিধানিক' বলে প্রকাশ্যে বক্তব্য রেখেছেন। ট্রাম্প প্রশাসনও এই সিদ্ধান্তকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে। ই ইউ-এর অবস্থান একই।

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, মালদ্বীপের পরিস্থিতি ক্রমশ ইয়ামিনের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। যে কারণে তিনি ও চীন ক্রমশ ঘাবড়ে যাচ্ছেন। ভারত মালদ্বীপের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে খুবই সংযত ভূমিকা প্রদর্শন করেছে। দিল্লি কোনও প্ররোচনামূলক বক্তব্য পেশ করেনি। শুধু বলেছে ভারত দ্বীপরাষ্ট্রের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। জরুরি অবস্থার মেয়াদ একমাস বাড়ানোর সময় বিদেশমন্ত্রক যথার্থভাবে মন্তব্য করেছিল ইয়ামিন সরকার জরুরি অবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি করার সময় 'কোনও বৈধ' কারণ' দেখাতে পারেনি। মালের সরকারকে দিল্লি সরকার অনুরোধ করছে দেশের রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে। প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে ছেড়ে দিতে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাভাবিক সক্রিয়তা ফিরিয়ে আনতে। আসলে মালদ্বীপবাসীর মূল দাবিগুলোকে তুলে ধরে তার যথার্থ মর্যাদা দিচ্ছে ভারত।

নাশিদ সঠিক কথাই বলেছেন। ইয়ামিন চীনের সাহায্যে ক্ষমতায় থাকার লোভে তাঁর দেশের এক একটি দ্বীপকে 'পিস বাই পিস হিসেবে' বিক্রি করে দিচ্ছেন, যাতে ভবিষ্যতে দ্বীপরাষ্ট্রটি বেজিংয়ের কলোনিতে পরিণত হয়। মালদ্বীপ যে চীনের কথায় ওঠে বসে তার অতি সাম্প্রতিক প্রমাণ হলো ভারত মহাসাগরে আন্তর্দেশীয় এক নৌমহড়ায় অংশগ্রহণের জন্য ভারতের আমন্ত্রকে প্রত্যাখান করা। চীন চাইছে দ্বীপরাষ্ট্রটি ভারতের মতোই সব সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুমাত্র বেজিংয়ের ওপর নির্ভরশীল হোক।

আসলে চীন ভারতকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলার যে ছক কষেছে তাতে মালদ্বীপের মুখ্য ভূমিকা আছে। যার জন্য ইয়ামিনের মতো এক স্বেচ্ছাচারীকে সর্বতোভাবে ক্ষমতায় রাখতে চীন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী আহমেদ নাশিদ এক বক্তব্যে বলেছেন, ''দ্বীপরাষ্ট্রটি এখন পুরোদস্তুর একনায়কতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। চীন এতে মদত দিচ্ছে নিজের স্বার্থে। দ্বীপপুঞ্জের যে সব ছোটো ছোটো জনবসতিহীন দ্বীপ আছে সেগুলোকে বেজিং নিজের দখলে আনতে চায়। দক্ষিণ চীন সাগরে বেজিং যেভাবে গাজোয়ারি করে জাপানের সেনকাকু দ্বীপকে নিজের দখলে আনার চেষ্টা করছে। ঠিক একই কায়দায় চীন আমাদের কিছু দ্বীপকে নিজের কবজায় নিতে বদ্ধপরিকর, যাতে আরব ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে তারা এক বিশাল নৌঘাটি তৈরি করতে পারে। সেখান থেকে চীন সব ধরনের কড়া নজরদারি চালাতে পারবে।''

মালদ্বীপের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভারতের নিরাপত্তার প্রতি যে এক বিশাল হুমকি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চীনের সঙ্গে যুঝতে হলে ভারতকে তার নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। মালদ্বীপে সেনা হস্তক্ষেপের বদলে গণতন্ত্র ও উদারনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতকে জোর সওয়াল করতে হবে। কারণ মালদ্বীপবাসীদেরও লক্ষ্য এক। ■

বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবাদর্শ ও দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্গাতা সৈয়দ আহমেদ খান

পুলকনারায়ণ ধর

ধর্মের ভিত্তিতে জাতিসত্তার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে, মুসলমান জনগণকে ক্ষেপিয়ে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষকে ভাগ করে ইংরেজদের নেতৃত্বে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস সৃষ্টি করেছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান দু'টুকরো হয়ে গেল। সৃষ্টি হলো বাংলাদেশের। দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর এই ঘটনা হলো একটি আঘাত। ইসলাম অন্য ধর্মের সঙ্গে মিলনের কথা ভাবতেই পারে না। অন্য ধর্মের মানুষকে ধর্মান্তরিত করে একই ছাঁচে অন্য ধর্মকে ফেলে তাকে বিলুপ্ত করতে করতে চলে। শেষ পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায় বা সত্তাকেও বিভক্ত করে। ইসলাম তার ধর্মকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করাকেই একমাত্র কর্তব্য বলে গণ্য করে। এই ভাবনাই ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের উৎস। প্রতিটি মুসলমান তাই দ্বিজাতি (অর্থাৎ অন্য জাতিকে না মানা) তত্ত্বেই সারবত্তা খুঁজে পায়— কোরানের আলোকে। দুনিয়া জুড়ে 'কোরান' প্রতিস্থাপন করা ও 'দার-উল-হরব'কে 'দার-উল-ইসলাম'-এর দেশে পরিণত করাই মুসলমানদের ধর্মীয় জাতিসত্তায় গ্রথিত। যে-কোনও বিষয়কে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করাটা হচ্ছে 'প্যানইসলামিক' আন্দোলন।

ভারত ভাগের জন্য প্রধানত মহম্মদ আলি জিন্নাকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু ভারত ভাগের পশ্চাৎপট ও পরিস্থিতির সৃষ্টির জন্য যে দু'জন কংগ্রেস নেতা দায়ী— তাঁরা হলেন গান্ধীজী ও নেহরু। এঁরা ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে তলে তলে এ ব্যাপারে যে যোগাযোগ রেখে চলতেন সে বিষয়ে নানা তথ্য-প্রমাণ ক্রমশ উদ্ভাসিত হচ্ছে। জিন্না এই পরিস্থিতিরই সৃষ্টি। কিন্তু জিন্না 'দ্বিজাতি' তত্ত্বের তাত্ত্বিক নেতা নন। জিন্না ছিলেন এই

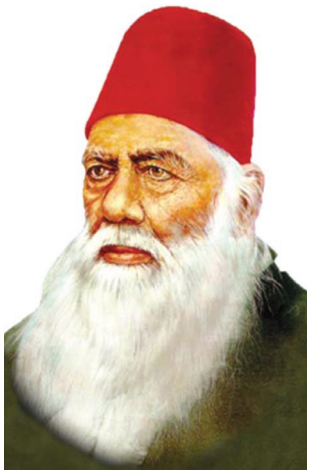

তত্ত্বের ভয়ঙ্কর রূপকার মাত্র। এই তত্ত্বের মূল খুঁজতে হবে আরও অতীতে। ভারতে এই তত্ত্বের ও দৃষ্টিকোণের প্রধান দার্শনিক স্যার সৈয়দ আহমেদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) এবং মহম্মদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮), যিনি কবি ও দার্শনিক।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, এই ইকবাল 'সারে যাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ-হামারা' সঙ্গীতের রচয়িতা। ভারতবর্ষ, অখণ্ড ভারতের যিনি বন্দনা করেছেন তিনিই পরে হয়ে উঠলেন দ্বিজাতি তত্ত্বের মুখ্য দার্শনিক ও পাকিস্তানের প্রবক্তা। জিন্না ছিলেন সৈয়দ আহমেদ খান ও মহম্মদ ইকবালের তত্ত্বের রাজনৈতিক বাস্তুকার।

সৈয়দ আহমেদ খানকে মনে করা হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের আধুনিক সংস্কারের প্রথম প্রবক্তা। জন্ম ১৭ অক্টোবর ১৮১৭ সালে। তাঁর পূর্বপুরুষ শাহজাহানের রাজত্বকালে পারস্য থেকে ভারতে এসেছিলেন। রাজপরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্কের জেরে বহু মান্যতা এই পরিবার লাভ করেছে। সৈয়দ আহমেদ এই ধারা ইংরেজদের সঙ্গেও বজায় রেখেছিলেন। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহে মুসলমান শাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরাজিতের মানসিকতা নিয়ে মুসলমানরা রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে রেখে ইংরেজি বা পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। যুগের দাবি থেকে তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। অন্যদিকে হিন্দু সমাজের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা মেনে নিতে কোনও অসুবিধা হয়নি। হিন্দুরা ইংরেজের স্বাভাবিক মিত্র হয়ে ওঠে। মুসলমান সমাজ নিজেকে অন্ধকার ঘেটোতে বন্দি করে রাখে। ক্রমশ সে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসীতে পরিণত হয়।

সৈয়দ আহমেদ খান এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক জলাভূমি থেকে উদ্ধার পাওয়ার এক নয়া রাস্তার অনুসন্ধান করেন। তিনি নিজেও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইসলামিক চিন্তাভাবনার সাযুজ্য ঘটিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের জাগরণ ঘটাতে হবে। কোরান ব্যাখ্যা করেই তিনি গোঁড়া মোল্লাদের অনুসৃত রীতি নীতি ও আচার-আচরণের বিরোধিতা করেন। মেয়েদের বোরখা পরা, বহুবিবাহ ও তালাক উচ্চারণ মাত্রেই বিবাহ বিচ্ছেদ (পুরুষের অধিকার) এইসব যুক্তিহীন অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার ধর্মের নামে প্রচলন করার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। মুসলমানদের তিনি আধুনিক মানসিকতা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর ধ্যান ধারণা প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'Scientific Society' (১৮৬৪)। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় তাঁকে এই কাজে সমর্থন করেনি। হিন্দুরা সৈয়দ আহমেদকে সহায়তা করেছিলেন। ১৮৭০ সালে তিনি 'Tehzibul Akhlaq' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের শক্তিতে

প্রতিষ্ঠালাভ না করলে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনও ভবিষ্যৎ নেই এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই কারণে তিনি স্থাপন করেন 'Anglo-oriental College', যা পরে রূপান্তরিত হয় 'আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে' (১৯২০)। মুসলমানদের স্বার্থের কথা ভেবে তিনি ইংরেজ শাসকদের সমর্থনের কথা বলেছিলেন। ইংরেজ দেশ থেকে চলে যাক তা তিনি চাননি। তিনি বুঝেছিলেন, ইংরেজ প্রভুদের তোয়াজ করেই একদিন মুসলমানরা তাদের মুক্তির পথ খুঁজে পাবে বা স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে। খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের ঐক্য অর্জনের তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তা হিন্দুদের থেকে সর্বক্ষেত্রেই মুসলমান সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তিনি 'Tabluulkalam' নামে একটি গ্রন্থ লিখে 'ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট'-এর নয়া ব্যাখ্যা করেছিলেন। ইংরেজ তাঁকে 'স্যার' উপাধি দিয়ে সম্মান জানায়। মোল্লারা সৈয়দ আহমেদ খানকে মেনে নেয়নি। কট্টর মোল্লারা যা অনুধাবন করতে পারেনি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সৈয়দ আহমেদ খান বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি এক 'মুসলিম ভারত' সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এবং এই কাজে তাঁর প্রয়োজন ছিল ইংরেজের সহায়তা। দেশভাগের প্রাক্কালে ইংরেজের 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর পরিকল্পনাকে এই কারণেই মৌলানা আবুল-কালাম আজাদ সমর্থন করেছিলেন। সৈয়দ আহমেদকে মোল্লারা 'কাফের' বলেও চিহ্নিত করে। এরা সৈয়দ আহমেদের পরিকল্পনাকে বুঝতে পারেনি। সৈয়দ আহমেদ খান 'প্যান ইসলামিক' ভাবনাকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি ওয়াহবি ভাবধারার একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি ইংরেজকে ওয়াহবি ভাবাদর্শের মুসলমানদের সম্পর্কে সন্দেহ ও অভিযোগ বর্জন করতে আবেদন জানিয়েছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর এতই গভীর সখ্য ছিল যে, তাঁর কথা বিবেচনা করে ওয়াহবিদের সম্পর্কে ইংরেজরা তাদের মত পরিবর্তন করে। মুসলমানদের ইংরেজ বিরোধিতার মুখ তিনি ঘুরিয়ে দেন ইংরেজ তোষণের দিকে। সৈয়দ আহমেদ নিজের অবস্থান শক্ত করার জন্য এক সময় হিন্দুদের সমর্থনও অর্জন করার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানদের তিনি নববধূর দু'টি চোখের সঙ্গেও তুলনা করেন। কিন্তু ক্রমশ সম্ভ্রান্ত ও অর্থবান মুসলমানরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালে তিনি হিন্দুদের সঙ্গ ও সহযোগিতা ত্যাগ করেন।

সৈয়দ আহমেদের মনের কথা আরও স্পষ্ট হলো যখন ১৮৮৫ সালে ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলের সৃষ্টি হলো। তিনি আদ্যোপান্ত গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্য ভাবনা সম্পন্ন দলটিকে ব্যাখ্যা করলেন 'হিন্দু'দের দল বলে। তিনি চূড়ান্ত ভাবে হিন্দু বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। থিয়োডর বেক নামে ২৪ বছরের এক যুবক এম.এ.ও. কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি আলিগড় আন্দোলনের তথা মুসলিম স্বার্থের একজন বিশিষ্ট পরামর্শদাতা ছিলেন। সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের উপদেশ দিলেন— ''তোমরা কংগ্রেসের সংস্রব সর্বপ্রকারে এড়িয়ে চলবে। কারণ, কংগ্রেস হিন্দুদের সংগঠন।'' তিনি মনে করতেন, কংগ্রেসের জন-প্রতিনিধিত্ব মূলক আসন ব্যবস্থার দাবির অর্থ মুসলমানদের হিন্দু জনসংখ্যার চাপে নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য করা। ভারতে হিন্দু আধিপত্য স্থাপিত হলে মুসলমানদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ১৮৮৮ সালে ১৬ মার্চ মিরাটে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন--- ''Suppose that the English Community and the army were to leave India, taking with them all their connons and their splendid weapons and all else, who then would be the rulers of India? It is possible that under these circumstances, two nations–the Mohammedans and the Hindus– could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other. To hope that both could remain equal is to desire the imposible and the inconceivable?'' সৈয়দ আহমেদ বলেছেন— ''...until one nation has conquered the other and make it obedient, peace can not reign in the land. (Evolution of Muslim Political Thought in India— Edited by A.M. Zaidi, Page-48)।

দ্বিজাতিতত্ত্বের এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষণ ও উস্কানি সৈয়দ আহমেদের পূর্বে কেউ দেননি। হিন্দু মুসলমানের ভিন্ন সত্তা ভারতে মুসলমানদের আগমনের সময় থেকেই প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে এর যৌক্তিকতা ও তার সম্ভাব্য পরিণাম বা লক্ষ্য নির্ধারণ প্রথম তাত্ত্বিক মর্যাদা পেল স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের ব্যাখ্যায়। সৈয়দ আহমেদ কোনও এক মুহূর্তে এক সুবিধাগত কারণে ভারতকে হিন্দু- মুসলমানের মাতৃভূমি বলে উল্লেখ করেছিলেন (India is the motherland of both of us... The waters of the Holy Ganges and Yamuna we both drink... our long settlement in India has changed our blood characteristics and has made us one.'' (পাটনায় প্রদত্ত বক্তৃতা ১৮৮৩)। তাঁর এই মুখের কথা অন্তরের প্রলুপ্ত সাম্প্রদায়িক ভাবনায় মিথ্যা প্রমাণিত হলো কংগ্রেস সৃষ্টির পর (১৮৮৫)। সারা জীবন তিনি কংগ্রেস বা হিন্দু বিরোধিতার আগুনে মুসলমানদের তাত্ত্বিক ভাবনা জুগিয়েছেন। সমান্তরাল মুসলমান সংগঠন তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। জাতীয় জীবনের প্রধান স্রোত ধারাতে মুসলমানদের যোগদানের বিরোধিতা করেছেন। Ishtiaq Hussain Qureshi -এর 'The struggle for Pakistan' গ্রন্থটিতে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

এই 'আত্মশক্তি' প্রতিষ্ঠা তথা কমিউনিস্টদের ভাষায় 'মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি'— মহম্মদ ইকবালের গান গেয়েই উচ্চারিত হলো। ভারত ভাগ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবি উঠল। জিন্না হলেন এর রূপকার। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় আজকের মুসলমান নেতা ওয়াইসিরা হলেন সৈয়দ আহমেদেরই যোগ্য উত্তরসূরি।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

বাঙালির জন্য বিপন্ন বাংলা ভাষা

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মতো। কথাটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। মাতৃদুগ্ধে পালিত সন্তানেরা যেমন পুষ্ট ও সফল হয় অন্য দুগ্ধে পালিত সন্তানেরা তেমন হয় না। একথা পরীক্ষিত সত্য। ঠিক তেমনই মাতৃভাষায় যাদের শিক্ষার ভিত গড়ে ওঠে তা কোনও বিদেশি ভাষায় গড়ে ওঠা ভিতের থেকে অনেক মজবুত ও স্থায়ী হয়। বিদেশি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার মধ্যে যে কৃত্রিমতা আছে তা মাতৃভাষায় নেই। মাতৃভাষা যে মর্যাদা ও পুষ্টির জোগান দেয় বিদেশি ভাষা তা দেয় না। ফলে বিদেশি বা আমাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত মানুষেরা কিছুটা কৃত্রিম হয়ে গড়ে ওঠে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজির প্রসার ও মাতৃভাষাকে উপেক্ষার ফলে দিকে দিকে বাংলামাধ্যম স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা অনেকগুলি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী মিলিয়ে একটি স্কুল চালানো হচ্ছে। এ সমস্যা চলছে কয়েক দশক ধরে। প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে শুধুমাত্র মাতৃভাষা থাকবে, এই সরকারি সিদ্ধান্তে বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলির অবনমন দ্রুততর হয়। সেই ব্যবস্থায় শিক্ষিত কয়েক প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের ইংরেজি ভাষায় অদক্ষতা ও জীবিকার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে দুর্গতি হওয়ায় আবার স্বমহিমায় ইংরেজি ফিরে এসেছে সরকারি স্কুলগুলিতে।

বর্তমান যুগ অর্থকৌলিন্যের, সবার উপর বিত্ত সত্য তাহার উপর নাই-এর যুগ। এখনও বিশ্বজুড়ে ইংরেজি ভাষার বাজারদর চড়া। ফলে ইংরেজির প্রতি আকর্ষণের লেখচিত্র এখনও উর্ধ্বমুখী। মাতৃভাষা শিক্ষা করে সময় ব্যয় করাকে লোকে এখানে অপচয় ভাবে। আমরা জার্মান বা ফরাসিদের মতো নই, যারা ইংরেজির গুরুত্ব স্বীকার করে না। আমরা চীনেদের মতো নয় বা বাংলাদেশিদের মতোও নয় যারা ইংরেজির চেয়ে নিজেদের মাতৃভাষাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। চীন তার কৃষিসম্পদ, শিল্পোন্নয়ন ও খনিজসম্পদের বৃদ্ধি করে বিশ্বের অর্থব্যবস্থায় নিজের স্থান প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। সেখানে লোকে বিশ্বের অন্য বাজার ধরতে ইংরেজি শিখলেও নিজেদের মাতৃভাষাকে অবহেলা করে না। এর জন্যই পৃথিবীর অন্য দেশ, যারা চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক বা সামরিকভাবে যুক্ত হতে চায় তারা চীনেদের ভাষা মান্দারিন শিখছে। ভারত সত্তর বছরেরও বেশি ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে তবু ইংরেজির প্রতি আমাদের মুগ্ধতা কাটেনি। স্বাধীন হয়ে এত বছরেও আমরা শিল্পে বা অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিশ্ববাসীর সমীহ আদায় করতে পারিনি। দেশবাসীর মনে স্বাভিমান জাগিয়ে তুলতে পারিনি। বাংলাদেশ নিজেদের অস্মিতাকে ভোলেনি। সেখানেও বহু কনভেন্ট স্কুল ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেয়। কিন্তু সেখানকার আকাশে ক্রশ তুলে দিয়ে তাদের কোনও আস্ফালন নেই। ফলে বাংলাদেশিদের চেতনা সেখানে আচ্ছন্ন হয়নি। মাতৃভাষার গৌরব রক্ষার জন্য বহুপ্রাণের বিনিময়ে যে দেশের জন্ম সেখানে এখনও তাদের মাতৃভাষা স্বমহিমায় বিরাজ করছে। সেখানে দোকানের নাম, গাড়িতে নাম্বার প্লেট সব বাংলায়। কোথাও ইংরেজি নেই। অথচ তাদের দেশে বিদেশি ভ্রমণার্থীরা যে অসুবিধায় পড়ে এমনও নয়। আমরা তাদের কাছ থেকে কি মাতৃভাষাকে ভালবাসতে শিখতে পারি না? তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক গৌরব ধরে রেখেছে ভাষার মধ্য দিয়ে। ভারত তার সাংস্কৃতিক গৌরব ধরে রেখেছে প্রধানত তার চিরাচরিত জ্ঞান, ন্যায়বুদ্ধি ও ধর্মকে আশ্রয় করে। ভাষার গুরুত্ব এখানে তার পরে। ফলে বাঙালির ছেলে-মেয়েরা আজ ভালো করে নির্ভুল বাংলায় লিখতে পারে না, শুদ্ধভাবে শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলতে পারে না। তার ফলে প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায়, টিভির পর্দায় অজস্র উচ্চারণ ভুল, বানান ভুল চোখে পড়ে। আমরা রোহিত শর্মাকে লিখি ও উচ্চারণ করি 'রহিত শর্মা' বলে। 'মনমোহন সিংহ' উচ্চারিত হন মনমহন সিংহ হিসাবে। 'ও-কার' যে হিন্দিতে আছে তার জ্ঞান মনে হয় আমাদের নেই। অর্থহীন কথা লিখতে বা বলতে আমাদের বাধে না।

আমাদের এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয় নিয়ে শুধুমাত্র হা-হুতাশ করলে চলবে না। এই অবক্ষয়কে রুদ্ধ করে ক্রমে উজানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তার জন্য এক সর্বাত্মক প্রয়াস চাই। রাজনীতিকে এ ব্যাপার থেকে দূরে রাখতে হবে। বুঝতে হবে যারা আত্মগৌরব রক্ষা করে চলে অন্যরাও তাদের সম্মান করে। মাতৃভাষার আশ্রয় থেকে চ্যুত হওয়ার অর্থ নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলা, যার ভাণ্ডারে বিবিধ রতন আছে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়া। এজন্য শৈশব থেকেই সন্তানদের মাতৃভাষা শ্রদ্ধার সঙ্গে শেখাতে হবে। সঙ্গে ইংরেজিও শেখানো চলবে সমানভাবেই।

শিশুরা সবকিছুই খুব তাড়াতাড়ি শেখে। কোনও কিছু ভুলতেও তাদের দেরি লাগে না। তাই একেবারে শৈশবেই দুই বা ততোধিক ভাষার সঙ্গে শিশুদের পরিচিত করিয়ে দিতে হবে। একাজ সহজেই করা যায়। অক্ষর পরিচয় সম্পূর্ণ হলে ছন্দোবদ্ধ ভাবে কবিতার মাধ্যমে কোনও ভাষার কথাগুলি মুখস্থ করিয়ে দিতে হয়। পরে ব্যাকরণ ইত্যাদি শেখাবার সময় সেই সব ছন্দোবদ্ধ কথাগুলিরই সাহায্য নিতে হয়। 'আবৃত্তি সর্ববিদ্যানাম্ বোধোদপি গরীয়সী।' কথাটি সর্বৈব সত্য। কোনও পাঠ মুখস্থ হয়ে গেলে এবং তা মনে বসে গেলে আজীবন তা নানাভাবে নানা সময়ে অর্থবহ হয়ে মনে আসে। পাঠ্যক্রমে গদ্যাংশও সুনির্বাচিত হওয়া চাই যা হৃদয়গ্রাহী, যুক্তিগ্রাহ্য এবং চিত্তবৃত্তির বিকাশে সহায়ক হবে। যিনি পাঠ অভ্যাস করাবেন সেই শিক্ষককেও শ্রদ্ধাস্পদ হতে হবে। আজকাল কয়েক লক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে চাকরি পাওয়া শিক্ষকেরা চাকরি স্থায়ী হলেই লেগে পড়ে সেই নজরানার টাকা উশুল করে আরও সমৃদ্ধ হতে। প্রাইভেটে পড়ানো, স্কুল বা কলেজ চলাকালীন বাড়িতে বা অন্যত্র ব্যক্তিগত ক্লাসে ছাত্রদের ডাকা, স্কুলে ক্লাসের সময়ে বিশ্রাম নিয়ে শরীর রক্ষা করা ইত্যাদি চলতে থাকলে সেই শিক্ষক কখনও শ্রদ্ধেয় হন না এবং তাঁর কথা বা শেখানো পাঠ ছাত্রদের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাই আমাদের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকেই ঢেলে সাজাতে হবে।

(লেখিকা অবসরপ্রাপ্তা অধ্যাপিকা)

ভারতীয় ভাষাকে গুরুত্ব না দিলে তা হবে আত্মহত্যার শামিল

বিজয় আঢ্য

কিছুদিন আগে সন্ধের দিকে টিভির একটা বাংলা চ্যানেলে অনুষ্ঠান হচ্ছিল। এমনিতে টিভি দেখার অভ্যেস নেই। কিন্তু সেদিন চোখ দুটো টিভির পর্দায় আটকে গেল। অনুষ্ঠানটি বেশ মজার। বিষয় হলো— কোনও ইংরেজি শব্দ না বলে দু'মিনিট বাংলায় কথা বলতে হবে। এক একজন প্রতিযোগী আসছেন। শুরুটা ভালোই করছেন। কিন্তু চেয়ার টেবিল কাপ ডিস বাক্স আলমারি সেন্ট পাউডার ক্যালেন্ডার লাইন রেল টিকিট-এর মতো শব্দগুলি এলেই খেই হারিয়ে ফেলছেন। দেখতে বেশ ভালো লাগলেও মনের কোথাও যেন একটা মোচড় দিচ্ছিল। 'আ মরি বাংলা ভাষা'— 'মরি' শব্দটা কবির হর্ষোল্লাস না হয়ে লজ্জার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এই বোধটা অবশ্য ব্যক্তিগত, কেননা এ নিয়ে ভাষা-বিকৃতির অভিযোগটি বিতর্কের অবকাশ রাখে।

সমাজের বহু চলতি বিষয় ছেড়ে ভাষার মতো একটা জটিল কঠিন বিষয় নিয়ে কেন কলম ধরতে হলো— এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বর্তমান ভারতে এক শ্রেণীর মানুষ যারা নিরন্তর 'টলারেন্স' বা সহিষ্ণুতার গান গায়, তারা যে সংগঠনটিকে কিছুতেই 'টলারেট' বা সহ্য করতে পারে না তার নাম আর এস এস। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সম্প্রতি আর এস এসের প্রতিনিধি সভা এক প্রস্তাব পাশ করেছে যাতে সমস্ত ভারতীয় ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। ভাষার যে একটা সামাজিক মূল্য আছে তা বোধকরি কেউ অস্বীকার করবেন না। কোনও ব্যক্তি ও সমাজের আত্মপরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভাষা। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— 'ভাষা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি এবং পুষ্টি হয়। ধন বল, দল বন্ধন বল, বাণিজ্য বল, আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বল সকল গিয়াও সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল লোকের ধর্ম এবং ভাষা গিয়াছে, সে সকল লোকের স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এমন কথা বলা যায় না।" দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ান, আফ্রিকার নাইবেরিয়ার অধিবাসী ও রোমের (ইতালি) অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশের বা অঞ্চলের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভাষা সংস্কৃতির এক সজীব বাহক। আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি, উদাত্ত পরম্পরা, উৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং বিপুল সাহিত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ভাষা অত্যন্ত সহায়ক। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর বক্তব্যটি উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন— "বিচারে বসলে দেখা যাবে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বাহন সংস্কৃত ভারতী। সংস্কৃতের সঙ্গে সংস্কৃতির মিল কেবল আক্ষরিক নয়, একেবারে আন্তরিক।" সারা দেশে এখন জাতীয় সংহতি নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তিবিদ্যা দিয়ে নয়, বস্তুত একমাত্র সংস্কৃতি দিয়েই এই যোগসাধন সম্ভব। আর সেই সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গত কয়েক বছর ধরে এদেশে যে অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তার

কারণ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতের বিচ্ছেদ। আশার কথা, দেশের মানুষ এখন সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে ক্রমশ সচেতন হচ্ছে। সংস্কৃত ভারতীর মতো অনেক প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত ভাষার প্রসারে সচেষ্ট। দেশের জ্ঞান ভাণ্ডারে সঞ্চিত, বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য খড়্গপুর আই আই টি-তে সংস্কৃত পঠন পাঠনের জন্য ঐচ্ছিক কোর্স খোলা হয়েছে।

ভাষার এই গুরুত্বের কারণেই সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষা বা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাতেই করতে হবে। দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনে মাতৃভাষাতেই কথা বলতে হবে। মাতৃভাষার এই গুরুত্ব অনুভবের কারণেই পূর্ব পাকিস্তান আজ বাংলাদেশ। বছরখানেক আগে বাংলাদেশি এক লেখিকা কলকাতায় বেড়াতে এসে বলেছিলেন, খুব ভালো লাগছে। তবে বাংলা কথা বলতে বলতে আপনারা এত ইংরেজি বলেন, যা বিরক্তিকর। পূর্ব পাকিস্তান ও শিলচরের মানুষরা তাদের মাতৃভাষার স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি বজায় রাখতে শহিদের মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধা করেনি। একটা বিষয় স্পষ্ট যে, রাজ্য অর্থাৎ সরকারি আনুকূল্য ছাড়া ভাষার কোনও বিকাশ হতে পারে না। যেখানে রাজ্য সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে সেখানেই ভাষা এগিয়ে গিয়েছে। প্রাচীন গ্রিসে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালিতে। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু তা হয়নি। পাকিস্তান সরকার মুসলমান সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে উর্দুকে পূর্বপাকিস্তানের মানুষের উপর জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। যদিও পাকিস্তানের কোনও প্রদেশের ভাষাই উর্দু নয়। এরই প্রতিবাদে মাতৃভাষা বাংলার জন্য ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যাঁরা প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন, সেই মহান শহিদদের স্মৃতিতে দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারের তরফে পেশ করা ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। ভারতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষাগুলিরই ব্যবহার আরও দরকার। বিদেশি ভাষার শিক্ষা আমাদের ভারতীয় পরম্পরাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়

না। চলনে-বলনে একটা উন্নাসিকতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। দেশীয় ভাষায় লেখা বিভিন্ন সাহিত্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে না। মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমি ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি দূরত্ব বাড়ে।

মাতৃভাষার মহত্ত্ব নিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রঘুবীর নিজের জীবনের এক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। কর্মসূত্রে তাঁকে মাঝেমধ্যেই ফ্রান্সে যেতে হতো। ফ্রান্সে গেলে সেখানকার রাজপরিবারের আত্মীয়ের বাড়িতে তিনি অতিথি হিসেবে থাকতেন। ওই পরিবারের এক ছোট্ট মেয়ে ড. রঘুবীরকে খুব ভালোবাসত। কাকু কাকু বলে ডাকত। একদিন ডাকে ভারত থেকে আসা একটা খাম ড. রঘুবীরের কাছে এল। ছোট্ট মেয়েটা খামটা খুলে চিঠিটা তাকে দেখানোর জন্য আবদার করতে লাগল। ভারতের মানুষ কোন ভাষায় লেখে এটাই তার দেখার ইচ্ছে। মেয়েটির আবদার মেনে চিঠিটা খুলতেই সে বলে উঠল, আরে এতো ইংরেজি ভাষায় লেখা। কাকু তোমাদের নিজেদের ভাষা নেই? ড. রঘুবীর এ প্রশ্নের কীই বা উত্তর দেবেন। তাই চুপ করে রইলেন। সেদিন রাতের আহারটা একসঙ্গে হলো বটে, কিন্তু আগের দিনের মতো জমলো না। আসলে ছোট মেয়েটা তার মাকে কাকুর চিঠির বিষয়টা জানিয়েছিল। ফ্রান্সের মানুষের কাছে মাতৃভাষার স্থান অত্যন্ত গৌরবের। তাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তিই হলো ভাষা। এই ভাষার জোরেই ইউরোপের অন্যান্য জাতিগুলি থেকে তারা স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে।

প্রসঙ্গত একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৯৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইতালির তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি। তিনি ভাষণ দিলেন ইতালিয় ভাষাতেই। একজন তা তর্জমা করে দিলেন। ভাষা নিয়ে এই স্বাভিমান বোধ প্রশংসার দাবি রাখে। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বিশ্বের বিভিন্ন মঞ্চে যে হিন্দিতে ভাষণ দিচ্ছেন তা গৌরবের বিষয়।

ইজরায়েলের মানুষ যারা প্রায় দু'হাজার বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করেছে, তারা যখন নিজেদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধার করল, তখন স্বদেশের জাগতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা হিব্রুর পুনঃপ্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করল যা তারা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল। তাদের এই প্রচেষ্টা নিয়ে একটা কথা প্রচলিত— "It is a country where the mothers learn the mother toungue from their sons." (News From Isreal, May 1990)। আমাদের দেশে সংস্কৃতের মতো ভাষাকে 'ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ' বলে সরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা সেখানে হয়নি।

সৃজনশীল চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গবেষণায় আজ প্রমাণিত যে মাতৃভাষাই বিকাশের মূল ভিত্তি। দেখা গেছে, ইংরেজি বা অন্য বিদেশি ভাষায় শিক্ষিত ছাত্র- ছাত্রীদের তুলনায় মাতৃভাষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রহণ শক্তি অধিক। মাতৃভাষার মাধ্যমে নতুন কিছু শেখা সরল ও সহজ। ইংরেজি বা অন্য কোনও ভাষার মাধ্যম শিক্ষা হলে সেই সেই ভাষা হয়তো ভালোভাবে বলতে পারে, কিন্তু তর্ক বা যুক্তি দিয়ে নিজের অভিমতকে প্রতিষ্ঠা করার শক্তি তুলনায় ততটা জোরালো হতে পারে না। আর এই কারণে কোনও বিষয়কে যাচাই করে নেওয়ার ক্ষমতাও হয় সীমিত।

এইসব গবেষণায় আরও একটা বিষয় উঠে এসেছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণকারী ছাত্রদের ভিত দৃঢ় হয়। আর এই কারণে তাদের বিকাশ হয় গতিশীল— থেমে থাকে না। শেখাটা বোঝা হয়ে উঠে না। পাচকরস যেমন আহারের পাচন ক্রিয়ায় সাহায্য করে শরীরের পুষ্টি সাধন করে, মাতৃভাষাও তেমন অধীত বিদ্যাকে পুষ্ট করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে অনুশীলন আমাদের মানস গঠনেও সাহায্য করে। মনের ভাব যথাযথ প্রকাশের সহায়ক হয়। আপনি যাবেন না কি? আর যাবেন নাকি শুনলাম— উচ্চারণ ভেদে প্রথমটিতে জিজ্ঞাসা ও দ্বিতীয়টিতে সংশয় প্রকাশিত হয় যা মাতৃভাষাতেই সম্ভব। বিশ্বে প্রগতিশীল বলে পরিচিত রাশিয়া, চীন, জাপান ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে শিক্ষার মাধ্যম সেইসব দেশেরই নিজস্ব ভাষা। ইংরেজি ভাষাকে যারা আন্তর্জাতিক ভাষার তকমা দিতে চান, তারা সেইসব দেশরই মানুষ যা এক সময় ইংরেজের উপনিবেশ ছিল। এ কারণে এইসব দেশের মানুষরা অন্যদের তুলনায়, যেমন চীনাদের তুলনায়, ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে দক্ষ। মাতৃভাষা ব্যবহার করেও যে প্রগতিশীল হওয়া যায়— এই বাস্তবটা আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিতদের অনেকে আড়াল করে রাখতে সর্বদা সচেষ্ট, কেননা বিপরীত ঘটলে তাদের 'স্ট্যাটাস' প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে পারে। যদিও ঊনিশ শতকে আমাদের দেশে নবজাগরণের পুরোধা পুরুষরা নিজেদের প্রতিভার প্রকাশ মাতৃভাষার মাধ্যমেই করেছিলেন। আমাদের দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আবদুল কালাম বলেছেন, "তিনি যে আজ বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত তার কারণ তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করেছেন।" বস্তুত বর্তমান ভারতের প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত সকল মনীষীই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এখন তাই প্রয়োজন ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমেই প্রযুক্তি ও চিকিৎসা-সহ উচ্চশিক্ষার সমস্ত স্তরে শিক্ষণ, পাঠ্য সামগ্রী, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি প্রচলন করা। আশার কথা, সম্প্রতি উচ্চশিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট এবং ইউপিএসসি-র মাধ্যমে আয়োজিত সমস্ত পরীক্ষা ভারতীয় ভাষায় গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক ও আদালতের সমস্ত কাজে, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের কাজে— যেমন নিযুক্তি, পদোন্নতি বা প্রশাসনিক কাজকর্মে ভারতীয় ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। ইতিমধ্যে অবশ্য রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহারে হিন্দি ভাষার মাধ্যমে আদালতের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৭ ধারা মতে প্রত্যেক ভারতীয়েরই শিক্ষা ও পরিষেবা ক্ষেত্রে নিজেদের মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার রয়েছে। অন্যান্য প্রদেশের আদালতগুলিতে যদি প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার হয়, তাহলে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষেরই, বিশেষত সাধারণ মানুষের বুঝতে সুবিধা হয় অভিযোগটি কী, কেনই বা সে বা তারা অভিযুক্ত এবং বিচারক যে রায় দিলেন তার কারণগুলিই বা কী।

এত সব কথার অর্থ এই নয় যে ইংরেজি বা বিদেশি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নেই। দেশ-কালের পরিস্থিতিতে তা প্রয়োজনও। নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা শেখা যে দরকার তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু ভারতের মতো বহুভাষিক দেশে আমাদের সংস্কৃতির বাহক ভাষাগুলির সংরক্ষণ ও প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হবে। অন্যথায় তা হবে আত্মঘাতের শামিল। ■

কাঁচরাপাড়া

‘শ্রীরাম’ ধ্বনিতে মুখরিত হলো পশ্চিমবঙ্গের আকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে রাজ্যের সর্বত্র মানুষের উদ্দীপনা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে। একদা নকশাল আন্দোলনের কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ২৫ হাজারের বেশি হিন্দু নর-নারী উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। রাম, সীতা, হনুমানের মূর্তি সংবলিত ১০টি ট্যাবলো শোভাযাত্রাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। ২ কিলোমিটার শোভাযাত্রায় রাস্তায় দু’পাশের মানুষও জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

সবচেয়ে বড় শোভাযাত্রা হয় ঈশ্বরপুরে। স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ প্রশাসনের মতে ৩ লক্ষ মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে, গাড়িতে, সংকীর্তন-সহ আসতে থাকে। সূর্যসেন স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে শ্রীরামচন্দ্রের পূজার পর সকাল সাড়ে ১০ টায় শোভাযাত্রা শুরু হয়। মানুষ প্রখর সূর্যতাপ উপেক্ষা করে ৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে দুপুর ১টায় চোপড়াঝাড় স্কুল ময়দানে পৌঁছয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনীলপদ গোস্বামী, হৃষীকেশ সাহা, গৌতম সরকার প্রমুখ। উত্তরবঙ্গের সব জেলায় একইরকম উৎসাহের পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে।

দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার সমস্ত ব্লক কেন্দ্রে শ্রীরামনবমী পালিত হয়। পুরুলিয়া শহরে ৭০ হাজার মানুষ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। সকাল ১১টায় শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে শহরের কেন্দ্রস্থল ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে পৌঁছয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতির কার্যকর্তা বলরাম সাঁতরা, প্রশান্ত দাস, সুরজ শর্মা, গৌরব সিংহ, পিন্টু বাউরী প্রমুখ। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় প্রায় পাঁচ হাজার বাইকের একটি শোভাযাত্রা বের হয়। পরে গোয়ালতোড়ে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের একটি সমাবেশ হয়।

বাঁকুড়া জেলায় ২৫ স্থানে শোভাযাত্রা

হয়। বাঁকুড়া শহরের শোভাযাত্রায় ২৫ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ১ হাজার যুবকের বাইক বাহিনী ছিল। নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ৩৬ হাজার নর-নারী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ২ হাজার মা-বোন ছিলেন। ১১৬টি গাড়িতে বিভিন্ন এলাকা থেকে সবাই আসেন।

কলকাতা ও হাওড়া মহানগরেও যথেষ্ট উদ্দীপনা সহকারে শ্রীরামনবমী পালিত হয়। কলকাতায় শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতির নামে শোভাযাত্রা হয়। কলকাতায় ২০টি শোভাযাত্রা হয়। তাতে শহরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

রাজ্যের সর্বত্রই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রামনবমী উৎসব পালিত হলেও, কয়েকটি জায়গায় শাসক দলের গুণ্ডাবাহিনী এবং শাসক দলেরই মদতপুষ্ট ইসলামিক মৌলবাদীরা রামনবমীর শোভাযাত্রার উপর হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে সব থেকে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে রানিগঞ্জ এবং আসানসোল এলাকায়। রানিগঞ্জে শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতির

মালদা শহর

নকশালবাড়ি

উলুবেড়িয়া

রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

উদ্যোগে ২৬ মার্চ রামনবমীর বিশাল শোভাযাত্রা বেরয়। অতর্কিতেই এই শোভাযাত্রার উপর হামলা চালায় ইসলামি মৌলবাদীরা। তাদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হন পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম দত্তচৌধুরী। হামলাকারীরা খুন করে মহেশ মণ্ডল নামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক সক্রিয় কর্মীকে।

এরপরই হিন্দুদের বাড়িঘরের ওপর হামলা চালানো হয়। লুঠতরাজ অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রাণভয়ে বহু হিন্দু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে পালান। রানিগঞ্জের পরদিনই আসানসোলেও রামনবমীর মিছিলের ওপর হামলা চালানো হয়। এখানেও বিহারি মুসলমান এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা হামলা চালায়।

পুলিশ নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নির্বিবাদে দুদিন ধরে হিন্দু এলাকাগুলিতে তাণ্ডব এবং লুঠতরাজ চালায় ইসলামিক মৌলবাদীরা। এই দুই জায়গায় ছাড়াও পুরুলিয়া, কাটোয়া, কান্দি, ভাটপাড়া প্রভৃতি এলাকাতেও রামনবমীর শোভাযাত্রার ওপর হামল চালানো হয়। কাটোয়ায় রামনবমী শোভাযাত্রার প্রধান সংগঠক পূর্ণেন্দু দত্তের পিতা গণেশ দত্তকে শাসক দলের স্থানীয় নেতারা ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে। আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশ কোথাওই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু আক্রান্তদের নামে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং হেনস্থা করা হচ্ছে। ■

পুরুলিয়া

বসিরহাট

ঈশ্বরপুর (ইসলামপুর, উঃ ২৪ পঃ)

কল্যাণব্রতী মননশীলতাই বুদ্ধিজীবীর ধর্ম

অশোক কুমার চক্রবর্তী

ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরায় বুদ্ধিজীবীর স্বধর্ম হলো হাজার প্রতিকূলতার মধ্যে সত্য ও ধর্মে অবিচল থাকা। সমাজের মঙ্গলের জন্য অন্যায় বক্তব্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া— বুদ্ধির সাহায্যেই সমাজের হিতসাধন। এই হিতসাধনের পিছনে ভারতীয় আদর্শের নিষ্কাম কর্মযোগ যুক্ত। জীবিকার সংকীর্ণ স্বার্থ নয়— বুদ্ধির সাহায্যে জীবিকার কথা প্রয়োগ করলে 'বুদ্ধিজীবী' শব্দেরই ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরায় বুদ্ধিজীবীদের অতীতকে ছোটো করে দেখানো হয়। বুদ্ধির সাহায্যেই সমাজের মঙ্গলসাধনে যিনি ব্রতী আর এই ব্রতে যিনি প্রত্যেক দিনের কর্মকে মিশিয়ে ফেলতে পেরেছেন, সেই মহৎ কর্মই হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন।

আচার্য চাণক্য হাজার প্রতিকূলতার মাঝে জ্ঞান, সততা, সাহসের যে পরিচয় রেখে গেছেন, মহামন্ত্রী রাক্ষসের

বিষকন্যাও তাঁকে আটকাতে পারেনি। অলডাস হাকসলে পরাধীন ভারতের দার্শনিক আদি শঙ্করাচার্যকে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলতে, শঙ্করাচার্যের দর্শনকে প্রথম ও শেষ কথা বলতে বা গ্রেফতার বরণ করতেও পিছপা হননি। শঙ্করাচার্য স্বয়ং বা স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয়

কালের নিয়মে এই সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কর্মের সঙ্গে বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠানের শুধুই বেতনভোগী, তিনি কোনও অবস্থাতেই বুদ্ধিজীবী নন, বুদ্ধিজীবী তিনি যিনি সত্য, ধর্মকথা বলতে দ্বিধা করেন না। ঠিক একইভাবে রাষ্ট্র গঠনের শুভ চেষ্টার বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে প্রতিবাদ বুদ্ধিজীবীর কর্মের মধ্যে পড়ে না।

সনাতনী প্রথাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মে প্রবল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে গিয়েছেন। এই কর্মের পিছনে ছিল নিষ্কাম কর্মসাধনা, ক্ষুদ্র জীবিকার স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণা নয়।

বুদ্ধিজীবী নির্ধারণের তত্ত্ব বেদের কর্মকাণ্ড থেকে এসেছে। জ্যোতিষশাস্ত্র বেদের কর্মকাণ্ডের একটি ভাগ। পরাশর, ভৃগু আদি মুনিরা জ্যোতিষের আদি প্রবক্তা। মহামুনি ব্যাসদেব যোগে নবগ্রহ দর্শন করে, নবগ্রহস্তোত্রে

সেকালেই নবগ্রহের রূপ ও রং বলে গেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে সূক্ষ্ম শরীরে গ্রহ ও মানবগণের মধ্যে যোগ প্রত্যক্ষণ ও স্থাপন করেছেন। মানবজীবনে গ্রহের প্রভাব বলতে গিয়ে মানবজীবনকে বারোটিভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে কর্মভাগ দশম ভাগ। দশম স্থান থেকেই কর্মজীবী নির্ধারণ হয়। এই কর্মজীবী বুদ্ধিজীবী হলেন কিনা সে সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা রয়েছে।

সমাজবিদ্যার সঙ্গে জ্যোতিষকে যুক্ত করে গ্রহ ও মানবগণকে একই পর্যায়ে একই 'চক্রে' এনেছেন জ্যোতিষের প্রবক্তারা। কর্মের বিচারে বুধ গ্রহের সঙ্গে ব্যবসার কথা, শুক্র গ্রহের সঙ্গে কপটতার কথা, চন্দ্রগ্রহের সঙ্গে ভোগবিলাসের কথা এসে যাওয়ার প্রতীকী কারণে বুদ্ধিজীবী নন। আর মানবগণের জন্মকুণ্ডলীতে শুধু এই বুধ গ্রহ, শুক্রগ্রহ ও চন্দ্রগ্রহের কৃপাধন্য মানবগণ প্রকৃত বুদ্ধিজীবী হতে পারেন না। যদি না বৃহস্পতি গ্রহ ও শনি গ্রহের কৃপাযুক্ত হন। সাত্ত্বিক, ধার্মিক বৃহস্পতি গ্রহের ও কঠোর বৈরাগী যোগী, ত্যাগী শনিগ্রহের কৃপাধন্য মানবগণ নিজের

জীবনে সত্য ও ধর্মকে ধারণ করে ইতিহাসের পাতায় বুদ্ধিজীবী হিসাবেই থেকে যাচ্ছেন।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রয়োগ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কিছু অংশ ব্যবসার দিকটি বেশি দৃষ্টি দেওয়ায়, ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি থেকে দূরে চলে গেছেন। শুক্রাচার্য দেবগুরু বৃহস্পতিকে শাস্ত্রে পরাজিত করেও কপট বুদ্ধির জন্য শাস্ত্রে ইতিহাসে সৎসাহসী পণ্ডিত বৃহস্পতি ও ত্যাগী যোগী শনির কাছে বুদ্ধিজীবীর বিচারে গৌণ হয়ে গেলেন। চন্দ্র শিল্প ও মননশক্তির কারক হয়েও ভোগবিলাসের জন্য বুদ্ধিজীবী নন। জ্যোতিষে মানবগণের ছকে সূর্যগ্রহ কখনই বুদ্ধিজীবীর প্রতীক না হয়েও দৃঢ়তার সঙ্গে সত্যকে স্বীকার করে। তাঁর মহত্ত্বকে গ্রহণ করে মানবগণ সূর্য তেজে বুদ্ধিজীবী হয়েছেন। মানব সন্ন্যাসী দ্বিজ সাধনায় সূর্যের মণ্ডলের মধ্যে যাত্রার সময়, সূর্য আকারে বিশাল হয়েও আকারে ক্ষুদ্র দ্বিজকে দেখে নমস্কার করেছেন, পথ ছেড়ে দিয়ে বলে উঠেছেন 'সন্ন্যাসীনং দ্বিজং দৃষ্টা স্থানাচলতি ভাস্করঃ এষমে মণ্ডলং ভিত্ত্বা পরব্রহ্মাদি গচ্ছতি'। সেই কারণেই সূর্যদেব হয়েছেন সকল বুদ্ধিজীবীদের শক্তি। প্রেরণার উৎস, বিজ্ঞানীদের পরিত্রাতা।

শ্রীচৈতন্যদেব গণবুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করেছিলেন, নিজের 'চৈতন্য' অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে। কর্মের বিচারে বুদ্ধিজীবীদের পূর্ণকুম্ভ, সমষ্টি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। গোটা বিশ্ব তা স্বীকার করছে, ভগবদগীতার তত্ত্ব আইনস্টাইন, শোপেনহাওয়ায়

শ্রেষ্ঠ বলতে দ্বিধা করেননি। টি এস এলিয়ট ভগবদগীতাকে শ্রেষ্ঠ 'আধ্যাত্মিক' কবিতা হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করেছেন। এলিয়ট সাহেব দান্তের রচনায় আলোচনা করতে গিয়ে ভগবদগীতাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের রাজধর্ম, রাজনীতি গোটা বিশ্বে প্রভাব ফেলেছে। নিষ্কাম কর্মযোগ রাশিয়া ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছেন কারাগারে, বন্ধন অবস্থায়, প্রাণ সংশয় নিয়ে। কংস, পুতনা, জরাসন্ধদের সঙ্গে আজীবন যুদ্ধ করেছেন— মানবজীবনের বন্ধন মুক্তির জন্য। রাজা হওয়ার সুযোগ থাকতেও তিনি রাজা হননি। অন্তরের কথায় গোকুল ছেড়েছেন, জরাসন্ধ বধের সংকল্পে বৃন্দাবন ছেড়েছেন, ধর্মস্থাপন করে হাসিমুখে গান্ধারীর অভিশাপ গ্রহণ করেছেন। মানবজাতির জন্য নিজের জীবনকে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ করে তুলেছেন। তিনি অপরকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে, বুদ্ধির প্রয়োগে অসাধ্য সাধন করেছেন। জ্ঞান ও বুদ্ধির সত্য ও ধর্মের সংমিশ্রণে তাঁর কর্ম হয়ে উঠেছে পূর্ণ। তিনি সকল কর্মের প্রেরণা। যাদব থেকে শুরু করে তিনি কেশব হয়েছেন মাধবের মধ্য দিয়েই। তাই তিনি 'জগতগুরু'।

কালের নিয়মে এই সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কর্মের সঙ্গে বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠানের শুধুই বেতনভোগী, তিনি কোনও অবস্থাতেই বুদ্ধিজীবী নন, বুদ্ধিজীবী তিনি যিনি সত্য, ধর্মকথা বলতে দ্বিধা করেন না। ঠিক একইভাবে রাষ্ট্র গঠনের শুভ চেষ্টার বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে প্রতিবাদ বুদ্ধিজীবীর কর্মের মধ্যে পড়ে না। সমাজের হিতসাধনের জন্য যিনি যে কোনও অবস্থাতেই প্রতিবাদ স্বরূপ, তিনিই বুদ্ধিজীবী। চিরাচরিত কাল ধরেই বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন গোষ্ঠীর দাসানুদাস নয়। বুদ্ধিজীবীর কোনও রঙ নেই। বুদ্ধিজীবী একটি বিশেষ 'সামাজিক সম্প্রদায়।' ■

হিন্দু জাতীয়তাবাদকে মানতেই যত আপত্তি উদারপন্থীদের

অতিথি কলম

আশুতোষ বার্ষ্ণেয়

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নেহরু ঘরানার বিশ্লেষক রাম গুহ উদারপন্থী হিসেবে অতি সম্প্রতি ত্রিশূল ও বোরখা সংক্রান্ত দুটি সম্প্রদায়গত বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন। কিন্তু মূল বিতর্কটা হচ্ছে এই উদারবাদীরা কীভাবে সংখ্যালঘু অধিকারগুলিকে বিচার করবে।

আমি এখানে একটু আলাদা হলেও এই বিষয়কেন্দ্রিকই একটা প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আলোচনা করব। বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে চলতে থাকা একটি বিতর্কের পরিসরকেই অন্তর্ভুক্ত করব। শোনা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী উদারবাদীদের সংখ্যা বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু। কেননা তাঁরা গভীরভাবে জাতীয়তা বিরোধী। আর এই জাতীয়তাবাদই বিশ্বব্যাপী ক্রম অগ্রসরমান। বলা হচ্ছে উদারবাদীরা সব ধরনের অধিকার, সে নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার, সংখ্যালঘুর অধিকার ইত্যাকার নানা বক্তব্য রাখতে সোচ্চার, কিন্তু কখনওই দেশের সামগ্রিক জাতি সত্তার অধিকার নিয়ে তাদের কিছু বলতে শোনা যায়নি।

সম্প্রতি পূর্ব ইউরোপের দেশ হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী অতি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন তিনি একজন 'অনুদারবাদী গণতন্ত্রী', যার অর্থ তিনি গণতান্ত্রিক বটে, তবে মূলত জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বস্ত। তিনি সরাসরি national foundation অর্থাৎ জাতীয় ভিত্তিভূমির ওপর আস্থাশীল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এই সূত্রেই ভারতবর্ষে উদারবাদীদের বোঝাতে অ্যান্টি ন্যাশানাল বলা হয়ে থাকে। উদারবাদীরা সেই অর্থে প্রকৃতই কি জাতীয়তা বিরোধী? এর উত্তর খুঁজতে দুটি বিষয়কে ব্যবচ্ছেদ করতে হবে (dissection)। উদারবাদ কী? আর জাতীয়তাবাদকেই বা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

চরিত্রগতভাবে উদারবাদীরা সরকারের সঙ্গে সাধারণত সহমত পোষণ করেন না। তাঁরা বলেন কোনও অধিকারকে লঙ্ঘিত হতে দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে অতি উদারবাদী ভাবনার পুরোধা জন স্টুয়ার্ট মিলকেও প্রায়শই ব্যবহার করা হয় উদারবাদী রাজনীতির সপক্ষে। উদারবাদ সংক্রান্ত যুক্তিগুলি যে সম্পূর্ণ অসত্য এমনটা নয়। আজকের দিনে উদারবাদের সপক্ষে নাগরিকদের যে তিনটি অধিকারের কথা বলা হয় যেমন— বাকস্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে মেলামেশার স্বাধীনতা। দেখা যায় এই অধিকার ও প্রয়োগ নিয়েই সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাঁধে। এই অধিকারগুলি সংবিধানে নথিবদ্ধ থাকায় উদারবাদীদের মত অনুযায়ী সরকারের ভূমিকাই অত্যন্ত গৌণ হয়ে পড়ে। আর সরকারের ভূমিকাকে এই ভাবে খর্বিত করে দেওয়াটাই উদারবাদী রাজনৈতিক ভাবনার লক্ষ্য। উদারবাদী চিন্তকরা বিশ্বাস করেন, সরকার কখনই এই অধিকারগুলি অপহরণ করতে পারে না। কেবলমাত্র আপৎকালীন অবস্থায়, তাও তাঁদের বিবেচনায় কোনও বানানো বা মেকি আপৎকালীন অবস্থা সৃষ্টি করে নয়। বাস্তবে যখন সকলেরই নজরে পড়বে যে, দেশের পক্ষে একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তখনই কেবল অধিকারগুলিকে খর্ব করা যেতে পারে। তবে, সেরকম পরিস্থিতি কী তার কোনও উদাহরণ তাঁরা দেননি। উদারবাদও যেমন নানা রূপে, চেহারায় উপস্থিত হয় ঠিক তেমনি জাতীয়তাবাদও একাধিক কাঠামোয় তার স্বরূপ প্রকাশ করে। সেটি কখনই একমুখী নয়। জাতীয়তাবাদ নিয়ে লিখিত যে বিপুল সাহিত্য সম্ভার পাওয়া যায় তার মধ্যে সাধারণত দু' ধরনের ভাবনা বা বিষয় প্রস্ফুটিত হয় : (১) নাগরিক জাতীয়তাবাদ, (২) জাতিগত জাতীয়তাবাদ। নাগরিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী দেশগুলির ক্ষেত্রে সেখানে জন্মানো যে-কোনও জাতি, ধর্ম, বর্ণের

> "আমাদের দেশে নাগরিক জাতীয়তাবাদ ছিল নেহরু জমানায় চাপিয়ে দেওয়া। এর মধ্যে যে বিষয়টার ব্যাপারে গান্ধী, নেহরু, আম্বেদকর তিনজনেই একমত হয়েছিলেন তা হলো সমস্ত ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মানুষই ভারতীয় জাতিসত্তার চোখে এক।"

মানুষই সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করার অধিকারী হয়। এই সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স এই নাগরিক জাতীয়তাবাদী দেশের সংজ্ঞার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। এই দুটি দেশেই স্বাধীনতার দাবিতে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল চরিত্রগতভাবে তা ছিল নাগরিক আদর্শের অনুযায়ী। Liberty, fraternity, equality-কথাটি ফরাসি বিপ্লবের সময়কে স্মরণে আনবে।

জাতিগত জাতীয়তাবাদের ধারণা একটু অন্যভাবে ভাবা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী জাতিগত, বর্ণগত বা ধর্মীয়ভাবে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই দেশটি সেই গরিষ্ঠাংশ মানুষদের দেশ হিসেবেই পরিচিত হবে। এখানে সংখ্যালঘুরা থাকলেও দেশটির জাতিগত পরিচয়ে তারা কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না। রক্ত সম্পর্কে একাত্মতাই এই জাতীয়বাদের বন্ধনগ্রন্থি—নাগরিক অধিকারের বিষয়টি গৌণ। পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসে জার্মানি ও জাপান এই জাতীয়তাবাদের ধারক হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে।

এই সংক্রান্ত তুলনামূলক 'Citizenship & Nationhood in France & Gerrmany' গ্রন্থে লেখক করেফার লিখেছেন ফরাসি বিপ্লবের পর যারাই সে দেশে জন্মেছে ফ্রান্স তাদের সবাইকেই নির্বিচারে নাগরিকত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে পারিবারিক ভাবে জার্মানিতে কোনও রক্তসূত্র থাকলে তবেই জার্মানিতে জন্মানো মানুষেরা নাগরিকত্ব পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই ঐতিহাসিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তুরস্কের যত লোক কর্মসূত্রে জার্মানিতে এসে সন্তান-সন্ততি জন্ম দিয়েছে যা সংখ্যায় কয়েক মিলিয়ন এবং সেখানে বসবাস করছে তাদেরও কিন্তু জার্মানি 'অতিথি কর্মীর' স্টেটাস দিয়েছে—নাগরিকত্ব নয়। এই দুটি ঘরানার জাতীয়তাবাদের মধ্যে নাগরিক জাতীয়তাবাদ উদারবাদীদের ধারণার সঙ্গে মাপসই। অন্যদিকে জাতিগত জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে যেহেতু সংখ্যালঘুরা (দেশ-কাল-ইতিহাস নির্বিশেষে এদের চরিত্র কিন্তু পরিবর্তনশীল যেটি এখানে গ্রাহ্য করা হয় না) সেরকম মান্যতা পায় না। সেই কারণে উদারবাদীরা এক্ষেত্রে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। তাঁরা যুক্তি দেন জাতীয়তাবাদের বিরোধী না হলেও তাঁরা এই ধরনের নির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদের বিরোধী।

এখন এই আঙ্গিকটিকে ভারতের পরিসরে বিচার করা যেতে পারে। প্রথম প্রশ্নটি উঠবে তত্ত্বগতভাবে বিভাজন নিয়ে। ভারত কি নাগরিকপন্থী না জাতীয়তাপন্থী? সংবিধান অনুযায়ী দেখলে ভারত জাতিগত জাতীয়তাবাদের থেকে নাগরিক জাতীয়তাবাদের দিকেই কিছুটা ঝুঁকে রয়েছে। ১৯৫০-এর দশকে পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা ও মালয়েশিয়ায় বসবাস করা বহু ভারতীয় বংশানুক্রমিকভাবে ওই দেশগুলিতে থাকলেও তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। তাদের ওই দেশগুলির রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার উপদেশই দেওয়া হয়। তেমনি কোনও ধর্মীয় বা জাতিগত জনগোষ্ঠীকেই আলাদা কোনও মর্যাদা সংবিধানগত ভাবে দেওয়া হয়নি। আইনগতভাবে সকল নাগরিকই ছিল সমান।

আমাদের দেশে নাগরিক জাতীয়তাবাদ ছিল নেহরু জমানায় চাপিয়ে দেওয়া। এর মধ্যে যে বিষয়টার ব্যাপারে গান্ধী, নেহরু, আম্বেদকর তিনজনেই একমত হয়েছিলেন তা হলো সমস্ত ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মানুষই ভারতীয় জাতিসত্তার চোখে এক।

উদারবাদীরা কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী। কেননা এটি এক অর্থে জাতিগত জাতীয়তাবাদ। এটি সে অর্থে নাগরিক জাতীয়তাবাদ নয়। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী এই ভাবনায় দেশের হিন্দু গরিষ্ঠাংশই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধে আদায় করে ও তারা সংখ্যালঘুদের প্রতি মোটেই সদয় নয়, বিশেষ করে যদি তাদের ধর্মের উৎপত্তি ভারতের বাইরে হয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের কথাই তাঁরা বলেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁরা নেহরুর কোনও কোনও জীবনীকারের লেখা উল্লেখ করে (কোনও নির্দিষ্ট নাম দেওয়া হয়নি) বলেন নেহরু নাকি দপ্তরে সব সময় দুটি দলিল রাখতেন যার একটি মহাত্মা গান্ধীর ভাবনা অনুসৃত, অপরটি ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষ্য। উদ্দেশ্যটি হলো, তিনি সংবিধান অনুযায়ী ভারতে বসবাসকারী সকল নাগরিককেই গান্ধীর মত অনুযায়ী গ্রহণ করবেন, কিন্তু দেশকে যারা ভাঙতে চাইবে তাদের ক্ষেত্রে লিঙ্কনের মত কঠিন হস্ত হবেন। তাদের কোনও দয়া দেখানো হবে না। নেহরুর এই গল্পটি ভারতীয় উদারবাদীরা অনুসরণ করছেন বলে গর্ববোধ করেন। তাঁরা তাই হিন্দু জাতীয়তাবাদকে নস্যাৎ করেছেন। কিন্তু সুবিধে মতো ভুলে যান এটা মার্কিন বা ফরাসি দেশ নয়।

এখানে নির্দিষ্ট ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে দু'টুকরো করে কোটি কোটি মানুষকে নিঃস্ব করা হয়েছিল। এর পর আবার নতুন প্রজন্মে দেশটি অতি কট্টরবাদের কবলে পড়ে পুনর্খণ্ডিত হয়ে যায়। সেখানে ধর্মীয় নির্যাতন, বিতাড়ন, ধর্ষণ অকাতরে চলেছে। তাই কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞার ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ধরার চেষ্টা নিরর্থক। এখানে বহু চক্র সক্রিয়। জাতীয়তাবাদ কখনই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশ নিরপেক্ষ নয়, আমেরিকা ফ্রান্সে কোনও মিশনারি অনুপ্রবেশে জনগোষ্ঠীর পরিচয় বদল হয়ে যায়নি। এ আলোচনা তাই অত সরল রৈখিক নয়। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

জাতীয় সঙ্গীত থেকে ‘সিন্ধু’ বাদ?

অসমের জনৈক কংগ্রেস সাংসদ জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন থেকে ‘সিন্ধু’ শব্দটি বাদ দিয়ে ‘উত্তর-পূর্ব’ বা ওই অঞ্চলের পরিচয় বহনকারী কোনও শব্দকে সেখানে বসানোর দাবি তুলেছেন। ‘উত্তর-পূর্ব’ বা ওই এলাকার পরিচয় বহনকারী কোনও শব্দকে নিয়ে এলে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ রয়েছে তা বহুলাংশে হবে দূরীভূত। তাঁর আরও বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন গানটি লিখেছেন তখন সিন্ধু ছিল ভারতের অংশ। কিন্তু আজ সেটি পাকিস্তানে। তাই ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে ‘সিন্ধু’র উল্লেখ থাকা অনুচিত।

স্বভাবতই ওই সাংসদের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা উঠেছে দেশ জুড়ে। প্রতিবাদ করেছে বিশ্ব সিন্ধি ফোরাম। ফোরামের প্রধান সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘সিন্ধ’ শব্দটি থেকে ‘হিন্দ’ বা ‘হিন্দুস্থান’ শব্দের উৎপত্তি। এই উপমহাদেশের ভাবনার মূলে রয়েছে প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার ও ভাবনাচিন্তা করেই জাতীয় সঙ্গীতে ‘সিন্ধু’ শব্দটি যুক্ত করেছেন। তাছাড়া এদেশের সিন্ধি সমাজের বহু লোক রয়েছে, যারা পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্ম নয়।

সত্যি বলতে কী, জাতীয় সঙ্গীত সাধারণত অপরিবর্তনীয়। একটি দেশের পরিচয়বহনকারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর ভাবনা-চিন্তার ফসল ‘জনগণমন’ জাতীয় সঙ্গীতটি। একথাও ঠিক, একটি গানে ভারতের সব রাজ্যের নামের উল্লেখ অসম্ভব। তাই বাকিগুলির উল্লেখ রয়েছে অঞ্চল রূপে ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে। যেমন, গানটিতে বিহার-উত্তরপ্রদেশের উল্লেখ না থাকলেও গঙ্গা-যমুনার নাম রয়েছে। ওই দু’টি রাজ্যের মধ্য দিয়ে গঙ্গা-যমুনা প্রবহমান। ‘বিন্ধ্য’ শব্দ দ্বারা মধ্যভারতের রাজ্যগুলিকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উল্লেখ নেই একথা ঠিক নয়। তাছাড়া ‘সিন্ধু’ হলো একটি শব্দ। আর উত্তর-পূর্ব হলো দু’টি শব্দ। তাই একটি শব্দের (সিন্ধু) স্থলে দু’টি শব্দ (উত্তর-পূর্ব) বসালে উচ্চারণগত অসুবিধার সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি জাতীয় সঙ্গীতের আংশিক পরিবর্তনও রচয়িতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

ইতিহাসের পুনর্লিখন

১৯ মার্চ/৪ চৈত্র সংখ্যার সম্পাদকীয়, ‘ইতিহাস পুনর্লিখন জরুরি’, পড়ে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। ইতিহাসের ঘটনাক্রম তো নানান দৃষ্টিকোণ থেকে যুগে যুগেই লেখা হয়ে থাকে, কিন্তু রাজন্য-পৃষ্ঠপোষকতায় কোন দৃষ্টিকোণটি বহুল ব্যবহৃত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা শাসক উপযোগী— সে বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনাই তো বেশি দরকার। ব্রিটিশ উপনিবেশিকতার প্রভাব এ দেশের শিক্ষা বা শাসন-ব্যবস্থা কেউই এড়াতে চায়নি। নেহরুকে ব্যবহার করেই না কাশ্মীর-কাঁটা ভারতের মাথায় ফুটিয়ে দেওয়া হলো! মাউন্টব্যাটেন- পত্নীর সঙ্গে নেহরুর সম্পর্ক তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে রুচিতে বাধে। বরং, দুঃখিনী বালিকা, মাতৃহীনা ইন্দিরার বেড়ে ওঠার সঙ্গে এই দেশকে মিলিয়ে দেখি। বিবাহবিচ্ছিন্না বা স্বামী পরিত্যক্তা, যেভাবেই তাঁকে দেখি— পিতা হিসেবে নেহরু কীইবা করতে পারতেন বিধর্মী জামাতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া? কাজেই, বিলিতিপনার ভানে উদারনৈতিক সাজে তাঁকে ‘সেকুলার’ হতেই হয়! কিন্তু এসব বাদ দিয়েও আরও কিছু জ্বলন্ত প্রশ্নের জবাব আমাদের পাওয়া দরকার।

দীনদয়াল উপাধ্যায় খুন হয়েছিলেন কোন চক্রান্তে? শ্যামাপ্রসাদের রহস্যমৃত্যু নিয়েও নানান কথা এদিক ওদিক পড়ি, কিন্তু সর্বভারতীয় ইংরেজি পত্রিকায় পেয়েছিলাম একটি বিস্ফোরক বিষয়। পশ্চিমবাংলার জনগণ যখন শ্যামাপ্রসাদের শেষ দিনগুলো নিয়ে কৌতূহলী, তাঁর মায়ের আবেগ বাঙালির চিত্তে সঞ্চারিত হয়ে ব্যাপক আন্দোলনের চেহারা পাচ্ছে, ঠিক তখনই, উত্তেজনার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেবার জন্য বামপন্থীদের দিয়ে ট্রাম পোড়ানোর সেই ‘এক পয়সার আন্দোলন’ ঘটানো হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের মদতে। এই আঁতাতের ট্র্যাডিশান তো আজ অবধি চলেছে! নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে নিয়েও নানান কাহিনি পল্লবিত এই তথ্য-বিস্ফারের যুগে। আমরা সত্য ঘটনা জানতে চাই, ভারত সরকারের স্পষ্ট কথা শুনতে চাই।

—নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়,
রহড়া, কলকাতা-৭০০১৯৮।

দেশদ্রোহীদের সাজা

গত ৭ মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জুবি সাহার নেতৃত্বে র‍্যাডিকেল নামে একটি অতিবাম সংস্থার ৫ জন ছাত্র কেওড়াতলায় শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি হাতুড়ির আঘাতে ভেঙে তাতে আলকাতরা লেপে দিয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যাবে এই ছাত্রদের বাপঠাকুরদারা পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের হাতে মার খেয়ে শ্যামাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

এই দেশদ্রোহীদের পিতৃভূমিতে, দেশদ্রোহীদের কী ধরনের শাস্তি হয় তার একটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি যা গত ৪ জানুয়ারি ২০১৪ -তে একটা প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে :

‘কুকুরের খাঁচায় মৃত্যুদণ্ড’

বেজিংয়ের সংবাদ উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উনের পিসেমশাই ও রাজনৈতিক মন্ত্রণাদাতা জ্যাং সংমিং ও তার পাঁচ সঙ্গীকে বিবস্ত্র করে ক্ষুধার্ত ডালকুত্তার খাঁচায় ফেলে দিয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। চীনের এক সংবাদপত্র বলছে, এক ঘণ্টার মধ্যেই রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিদের ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছিল তিন দিনের উপাবাসী অভুক্ত কুকুরের দাঁত। তিন দিন ধরে উপবাসে রাখা ১২০টি ডালকুত্তার

খাঁচায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উনের পিসেমশাই ও রাজনৈতিক গুরু জ্যাং সং থিম এবং তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের। পরণে কাপড় নেই পালিয়ে বাঁচার মতো জায়গা নেই এমন পরিস্থিতিতে উত্তর কোরিয়ার কয়েকশো পদস্থ কর্তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কীভাবে ক্ষুধার্ত কুকুরের দাঁতে রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত মানুষগুলো ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

বাংলায় শ্রীরামনবমী

গত ২৫ মার্চ রামনবমী উপলক্ষ্যে জাগ্রত হিন্দুশক্তির মূর্তরূপ প্রত্যক্ষ করা গেল। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু কণ্ঠের সিংহগর্জন শোনা গেল! এ দৃশ্য একবার আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম ২৫/২৬ বছর আগে হিন্দুর অপমানের প্রতীক বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের সময়। সেকু-মাকু চিহ্নিত কিছু লোক কিন্তু ভয় পেয়ে গেছে। তারা বলছে, এটা নাকি বঙ্গসংস্কৃতি নয়। এটা গো-বলয়ের সংস্কৃতি। কী জঘন্য প্রাদেশিক মনোভাব। বাঙালি বলে কী অহঙ্কার। এরা জানে না, এই বাঙালিত্বের সংকীর্ণ মনোভাবকে 'বিদ্যাসাগর' নামক প্রবন্ধে অন্য একজন বিখ্যাত বাঙালি প্রবক্তাকার নিন্দা করে লিখে গেছেন 'যে বাঙালিত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করি তাহাও অতি ক্ষুদ্র কলেবর ধারণ করে।' এরা জানে না প্রভু রামচন্দ্র বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে এবং সম্ভবত তুলসীদাসেরও আগে কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ লিখে গেছেন এবং যে গ্রন্থখানি পরম্পরা অনুসারে বঙ্গদেশে সমাদৃত হয়ে আসছে। রামায়ণ নিয়ে বঙ্গপ্রদেশে রামলীলা যাত্রা বহুদিন যাবৎ হয়ে আসছে। এমনকী রামের নাম অনুসারে বাংলার বহু শহর ও গ্রামের নাম রাখা হয়েছে। যেমন--- শ্রীরামপুর, রামপুরহাট, রামচন্দ্রপুর, রামগড়, রামরাজাতলা ইত্যাদি। রামের নাম অনুসারে বহু বাঙালি হিন্দুর নামকরণ হয়ে থাকে। শিশুরা ভয় পেলে ছড়া কাটে 'ভূত আমার পুত, শাঁকচুন্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষণ বুকে আছে ভয়টা আমার কী?' এখানেও রাম নাম। নোংরা কিছু দেখলে আমরা বলে উঠি 'রাম রাম'। দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথে রামরাজাতলা নামে যে স্টেশনটি আছে তার কাছে রামমন্দিরে রামচন্দ্রের বিশাল মূর্তি আছে এবং রামনবমী থেকে সেখানে একটি বিরাট মেলা বসে যার বয়স হয়তো এক শতাব্দীরও বেশি।

সৈয়ত মুজতবা আলি 'ভারতবর্ষ' নামক প্রবন্ধে লিখে গেছেন— 'সই ট্রাডিশন সমানে চলেছে'। সেই ট্রাডিশন বলতে তিনি বংশ পরম্পরায় রামায়ণ পাঠ ও চর্চার কথা বলতে চেয়েছেন।

এইভাবে হিন্দুজনচিত্ত থেকে মর্যাদাপুরুষোত্তম রামকে মুছে দেওয়া এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে হিন্দুত্বকে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা চলে আসছে বছরের পর বছর। আজ রামনবমী উপলক্ষ্যে যে গৈরিক পতাকা নিয়ে যে জনপ্লাবন আমরা দেখলাম তা যেন বঞ্চিত-লাঞ্ছিত হিন্দুর বুকে পুঞ্জিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

—প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়,
পাটুলি, কলকাতা-৭০০৯৪।

রাহুল গান্ধীর পিতামহের পিতৃ-মাতৃ সংবাদ

ফিরোজ গান্ধীর (১৯১২-১৯৬০) জন্মশতবর্ষে 'উত্তরাধিকারহীন গান্ধী' এবং 'মানুষ ফিরোজ গান্ধীও...' শীর্ষক দুটি নিবন্ধ ২৬.১১.১২ তারিখের স্বস্তিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি নিবন্ধেই ফিরোজ গান্ধীকে এলাহাবাদের এক সম্পন্ন পার্শি পরিবারের সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরোক্ত নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ দত্ত 'গান্ধী পরিবারের অন্দরহমল' শীর্ষক পত্রে (স্বস্তিকা, ৩১.১২.১২) অন্য কথা বলেছেন। আমেরিকাবাসী অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের গ্রন্থসূত্র উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ফিরোজের বাবার নাম ম: নবাব খান; তিনি এক পার্শি মহিলাকে ইসলামে দীক্ষিত করে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরই গর্ভজাত সন্তান ফিরোজ। ম: নবাব খান এলাহাবাদের রেডলাইট এরিয়া মীরগঞ্জের এক মদ বিক্রেতা ছিলেন। ১৯৫১ সালের জানুয়ারিতে মুম্বই থেকে ফেরার পথে দুদিন এলাহাবাদে থেকে খোঁজখবর করে রবীন্দ্রবাবু জেনেছেন, স্কুলের খাতায় ফিরোজের পদবি ছিল 'খান'; এবং তাঁকে যিনি সুন্নত করিয়েছিলেন তাঁর নাম ম: এসাক।

সম্প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর (১৯১৭-১৯৮৪) জন্মশতবর্ষে ১৭.১১.১৭ তারিখের পাক্ষিক 'দেশ'-এ প্রকাশিত সুমিত মিত্র-র নিবন্ধে ফিরোজ গান্ধীর বিতর্কিত জন্মপরিচয় সম্বন্ধে অপর একটি তথ্য পেলাম। ইন্দিরা গান্ধীর জীবনী লেখিকা ক্যাথরিন ফ্রাঙ্ক লিখেছেন, আত্মীয়া বলে পরিচিত এক নামী চিকিৎসকের গৃহে ফিরোজ প্রতিপালিত। চিকিৎসকটি চিরকুমারী। ফিরোজ সম্ভবত সেই চিকিৎসকেরই অবৈধ সন্তান। 'গান্ধী' উপাধিটি ওই চিকিৎসকের এক গুজরাটবাসী আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার করা।

ফ্রাঙ্কের মতে, ফিরোজের জৈবিক পিতা ছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক প্রথিতযশা আইন ব্যবসায়ী, জাতিতে পঞ্জাবি ক্ষত্রী।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিমাইসাধন বসুর 'আমি : ইন্দিরা গান্ধী' পুস্তকে ইন্দিরা গান্ধীর জীবনপঞ্জীতে বলা হয়েছে ফিরোজ গান্ধীর পিতা জাহাঙ্গির ফারদুনজি, মাতা রত্তিবাই গান্ধী। দেখা যাচ্ছে, ফিরোজ গান্ধীর পিতাকে কোথাও মুসলমান, কোথাও পঞ্জাবি ক্ষত্রী এবং কোথাও পার্শি বলা হয়েছে। এমতাবস্থায়, গলায় পৈতে ঝুলিয়ে নিজেকে শিবভক্ত বলে প্রচারে ব্যস্ত না হয়ে, রাহুল গান্ধীর উচিত তাঁর পিতামহ ফিরোজ গান্ধীর মাতা ও পিতার প্রকৃত নাম ও ধর্মপরিচয় ব্যক্ত করা। নতুবা, সাধারণের মনে ধন্দ থেকে যাবে, ডালমে কুছ কালা হ্যায়।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

সিমলা কাঁসারিপাড়ার ঐতিহ্যপূর্ণ গাজন উৎসব

সপ্তর্ষি ঘোষ

চৈত্র মাসের শুরুটা আমরা জানতে পারি যখন শোনা যায় চির পরিচিত ডাক 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে— মহাদেব'। আর সঙ্গে বাজে ঢাক, ঢোল। তখন আমরা জানতে পারি যে, চৈত্র মাস শুরু হয়েছে এবং এই মাসের শেষেই হবে চড়ক। সেদিন চড়কে সন্ন্যাসীরা ঘোরেন। এছাড়াও তাঁরা আরও নানান কঠিন পরীক্ষা দেন দেবাদিদেব মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে। যেমন ধারালো বটির ওপর ঝাঁপ, তীক্ষ্ণ লোহার শলাকা বা কাঁটার ওপর ঝাঁপ। আবার জিভে তীক্ষ্ণ শলাকা বেঁধানো। কিন্তু শিব-ঠাকুরের অনুগ্রহে কারও কোনও ক্ষতি হয় না, এমনকী রক্তপাতও হয় না।

চড়ক উপলক্ষ্যে বসে বিশাল মেলা। যেখানে থাকে গৃহস্থলীর হরেক পসরার দোকান, নাগরদোলা ইত্যাদি। বিক্রি হয় নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য। সমাগম হয় অগণিত দর্শকের। তাঁরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। এই সব মেলা বসে কলকাতায়, গ্রামেগঞ্জে। তবে কলকাতার চড়ক মেলার কথা হলেই সর্বাগ্রে উত্তর কলকাতার ছাতুবাবুর বাজারের চড়কের মেলার কথাই মনে আসে। যা আজও হয় জাঁকজমক সহকারে। কিন্তু ছাতুবাবু বাজারের বহুদিনের এই জমকালো চড়ক উৎসবের পাশাপাশি আরও একটি প্রাচীন গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, ছাতুবাবুর বাজারের অনতিদূরে সিমলাপল্লীর তারক প্রামাণিক রোডে কাঁসারিপাড়ার সীতানাথ জিউ ও বালকনাথ জিউয়ের মন্দিরে। প্রতিদিন নিষ্ঠা সহকারে পুজো ও চৈত্রমাসে গাজন হয়।

কাঁসারিপাড়ার গাজন উৎসবে কাঁটা ঝাঁপের দৃশ্য।

কংসবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত মধুসূদন কুণ্ডুর নিঃসন্তান সহধর্মিণী বামাসুন্দরী দাসী ১৩০৭ বঙ্গাব্দে মন্দির নির্মাণ করে 'সীতানাথ জিউ' ও 'বালকনাথ জিউ' নামে দুই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩ নম্বর তারক প্রামাণিক রোডস্থ এই মন্দিরটি কলকাতা পুরসভার ঐতিহ্যবাহী ভবনের তালিকায় স্থান পেয়েছে। বহুপূর্বে এই রাস্তার নাম ছিল 'বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট'।

এই মন্দিরের পূজারি বংশপরম্পরায় পৌরোহিত্যের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। এই মন্দির সম্পর্কে একটি অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। একদিন মন্দিরের পূজারিকে একব্যক্তি বলেছিল, আপনি যে পাথরকে শিবরূপে পুজো করেন তা নিতান্ত পাথর ছাড়া কিছু নয়। তখন ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, এই শিব স্বয়ং ভোলানাথ এবং ইনি জাগ্রত। তখন লোকটি বলে, আপনি আমায় ভুল বোঝাচ্ছেন। আপনি প্রমাণ দিতে পারেন যে এই শিব জাগ্রত? ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, আমি প্রমাণ দিতে পারি, কিন্তু তাতে তোমার অনেক ক্ষতি হবে। তা কি তোমার পরিবার সহ্য করতে পারবে? লোকটি বলে, ওসব ভয় আমাকে দেখাবেন না। আমি ভয় পাই না। এই ভাবে দু'জনের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়। তখন ব্রাহ্মণ বলেন, দেখ এবার আমার শিব জাগ্রত কিনা। এই বলে তিনি একটি কলসী দিয়ে শিবলিঙ্গে সজোরে আঘাত করতে থাকেন। এতে শিবলিঙ্গের একাংশ ভেঙে যায় রক্ত বেরোতে থাকে। আর পূজারি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে মাটিতে পড়ে যান।

এখানে চৈত্র মাসে গাজন হয় চারদিন ধরে। কাঁটা ঝাঁপ, বটি ঝাঁপ, নীলের পুজো ও সবশেষে চড়ক। এই চারদিন কাঁসারি বাড়ির ছেলেমেয়েরা সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হয়ে ব্রত পালন করেন। তখন তাঁরা সীতানাথ জিউ ও বালকনাথ জিউয়ের সন্তান হিসেবে কৃচ্ছ্রসাধন করেন এবং বাবার নামজপ করেন। প্রথম দিন হয় কাঁটা ঝাঁপ। বাবার মাথায় চড়ানো হয় ফুল। এই ফুল যতক্ষণ না বাবার মাথা থেকে পতিত হয় ততক্ষণ কাঁটা ঝাঁপ হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, বাবার মাথা থেকে ফুল আপনা আপনিই পড়ে। মহাদেব যে জাগ্রত তার প্রমাণ এই ঘটনা। বাবার সন্তানরা বাবার নাম করেন এবং তারই মধ্যে ঘটে এই আশ্চর্য ঘটনা। সাক্ষী থাকেন অসংখ্য মানুষ। কাঁটা ঝাঁপের দিন সন্ন্যাসী বা সন্তানদের ডাবের জল, মিষ্টি দেওয়া হয় এবং মহিলারা এঁদের শিবজ্ঞানেই অর্চনা করেন। মূল সন্ন্যাসী হন শ্রীমাণী বাজার স্থিত কাঁসারিদের দাঁ পরিবার থেকে। বংশ পরম্পরায় এই প্রথা চলে আসছে। চারদিন মেলা বসে। বহুদূর থেকে মানুষ আসেন গাজন দেখতে। কাঁসারি সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রতিদিন শিবের আরাধনা করেন। ওঁ নমঃ শিবায়, বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব, বাবা সীতানাথের চরণে সেবা লাগে— সন্ন্যাসীদের গগনভেদী ধ্বনিতে এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। সিমলাপাড়ার গাজন উৎসব কংসবণিক সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব হলেও সবাই সানন্দে অংশগ্রহণ করেন।

অনুবাদ সাহিত্যের অনন্যপুরুষ কান্তিচন্দ্র ঘোষ

দেবপ্রসাদ মজুমদার

বিংশ শতাব্দীতে অনুবাদ সাহিত্যে যে সকল ব্যক্তি সাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কান্তি চন্দ্র ঘোষ অন্যতম। বর্তমানে ওই নাম হয়তো অনেকের কাছে বিস্মৃতির অন্তরালে। কিন্তু যাঁরা বিখ্যাত পার্শি কবি ওমর খৈয়ামের রুবাই বা চৌপদী সম্বন্ধে সম্যক পরিচিত তাঁরা অবশ্যই কান্তিচন্দ্রের নাম স্মরণ করবেন। কারণ ওমর খৈয়ামের রুবাই বা চৌপদীর রস-আস্বাদন বাঙালি তাঁর দ্বারাই লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা রায়বাহাদুর দীননাথ ঘোষ ছিলেন 'সিভিল লিভ কোর্ড ও সিভিল ট্রাভেলিং কোড'-এর সংকলনকর্তা এবং এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী।

অনুবাদ সাহিত্যে কান্তিচন্দ্রের আলোচনা কালে আমাদের অবশ্যই এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের (১৮০৯-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) নাম স্মরণ করতে হবে। কারণ এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের ইংরেজি মর্মানুবাদের দ্বারাই ওমর খৈয়ামের রুবাই বা চৌপদী তৎকালীন ইউরোপে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীকালে ওই ইংরেজি অনুবাদ থেকেই সারা বিশ্বে তাবৎ সুসভ্য জাতির ভাষায় ওমর খৈয়ামের রুবাই অনূদিত হয় এবং তিনি জগতে সমধিক পরিচিত হন। অনুরূপভাবে কান্তিচন্দ্র ফিটজেরাল্ডকৃত জগদ্‌বিখ্যাত ইংরেজি তর্জমা অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' অনুবাদ করে বাংলার সাহিত্য জগতে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন এবং তৎসহ বাঙালি সমাজ ওমর খৈয়াম ও তাঁর রুবাই সম্বন্ধে পরিচিত হয়ে রসাস্বাদনে সক্ষম হন। ওই বঙ্গানুবাদের কবি প্রশস্তি অংশে কান্তিচন্দ্র লিখেছিলেন—

''হাজার বছর পরে সে এক বাংলা দেশের কবি,
নিজের মাঝে দেখছে তোমার দুঃখ সুখের ছবি।''

বস্তুত 'মূল কাব্যের এই রসলীলা' বাংলা ছন্দে এত সহজে বহমান করতে পেরেছিলেন বলে প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদকের যে 'বিশেষ ক্ষমতার' উল্লেখ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর অনূদিত হাফেজের কবিতাও বাংলা সাহিত্যে এক সম্পদ বলা যায়।

ওমর খৈয়ামের রুবাই বা চৌপদীতে তিনি ছন্দের যে বৈচিত্র্য রচনা করেছিলেন, তা এক কথায় অনবদ্য। এছাড়া রস সৃষ্টিতেও ওই ছন্দ বৈচিত্র্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। শুধুমাত্র অনুবাদ সাহিত্যেই নয়, কান্তিচন্দ্র মৌলিক কাব্য সাহিত্য ও কথাসাহিত্য রচনায় যথেষ্ট সার্থকতা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তৎকালে কল্লোল, সবুজপত্র, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'সেবিকা', 'সনেট', 'ধূমকেতু' (গল্প সংকলন) প্রভৃতি। নানা সংবাদপত্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং সাংবাদিক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য তিনি তাঁর যুগচৈতন্যকে জাগ্রত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছিল। বঙ্গীয় আইন পরিষদের গ্রন্থাগারিক হিসেবেও তিনি স্বীয় কর্মপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সম্পাদক : সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। ২। ভারতকোষ— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ৩। অন্যান্য সাময়িক পত্রপত্রিকা।

সোনামুখির আখড়া

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থেকে বাসে সোনামুখিতে প্রবেশের আগেই দু-পাশের ঘন শালবন মন মুগ্ধ করে। অতীতে তাঁত শিল্প ও নকশা করা চিত্রিত মাটির হাঁড়ির জন্য সোনামুখির প্রসিদ্ধি ছিল। এখন এই স্থানের দ্রষ্টব্য বস্তু দুটি প্রাচীন মন্দির ও একটি আখড়া। সোনামুখি বাজারের চৌমাথা থেকে এক সরু গলিপথে এঁকেবেঁকে প্রায় দশ মিনিট হাঁটলে মনোহরদাসের আখড়া বা সমাধি মন্দির। বৈষ্ণবদের কাছে অন্যতম তীর্থস্থান। এই দালান-মন্দিরে বাবাজীর একজোড়া খড়ম রক্ষিত আছে। মনোহরদাস ছিলেন নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের শিষ্য। সোনামুখিতে তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে একটা গল্প শোনা যায়। শ্রীরামদাস অধিকারী নামে সোনামুখির এক ব্রাহ্মণ নিত্য শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবাপুজো করত। বিগ্রহটি তারই। একদিন পুজোর সময়ে কোনও সুন্দরী যুবতী গোয়ালিনীকে দেখে সে কামার্ত হয়। এই দৃশ্যকামের পাপবোধে জর্জরিত হয়ে ব্রাহ্মণ নিজের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে আত্মহত্যা করে। তার দুটো ছোট ছেলে-মেয়ে ছিল। মনোহরদাস বাবাজী তখন বৃন্দাবনে যাচ্ছিলেন। রামদাসের মৃত্যুর দুই দিন পরে বৃন্দাবনে না গিয়ে তিনি আচমকা সোনামুখিতে এসে পড়েন। তারপর রামদাসের নাবালক ছেলে-মেয়ের ভার গ্রহণ করেন। মেয়েটি বড় হলে, মনোহরদাস এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিয়ে দেন। সেই ব্রাহ্মণবংশের পুরোহিতরাই বাংশানুক্রমে আখড়ার পূজারি।

মনোহরদাস দিব্যশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর অতিলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে সোনামুখির তাঁতিরা বাবাজীর শরণাপন্ন হয়। এর নেপথ্যে যে জনশ্রুতি আছে, তা হলো, জনৈক কৌপীনধারী বৈষ্ণব সাধু একবার এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁতির কাছে একখণ্ড কাপড় ভিক্ষে চাইতে গেলে, তাঁতি দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। পরদিন দেখা যায়, অঞ্চলের তাঁতিদের তাঁতযন্ত্রগুলো অচল বা বিকল হয়ে গেছে। অনুতপ্ত তাঁতিরা তখন একযোগে মনোহরদাসের কাছে সেই অপরাধের ক্ষমা চাইলে, তাঁতযন্ত্রগুলো সচল হয়। বাবাজীর মৃত্যুর পর তাঁতিরা তাঁকে দেবতা রূপে মানতে শুরু হবে। তারা রামনবমীর দিনে বাবাজীর স্মরণে মেলা বসায়। মেলা উপলক্ষে আউল-বাউলদের সমাবেশ ঘটে সোনামুখিতে। আখড়া থেকে আরও কিছু রাস্তা এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, ইটের তৈরি পঁচিশ চূড়ার শ্রীধর মন্দির। ১২৫২ বঙ্গাব্দে তাঁতিরাই এই মন্দিরের নির্মাতা। তবে মন্দিরের শালগ্রাম শিলা এখন বাবুপাড়ার রাধারমণ মন্দিরে আছে। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

এরউইন শ্রোইডিঙ্গার : (১৮৮৭-১৯৬১)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বৈজ্ঞানিক। তাঁর অসামান্য 'ওয়েভ মেকানিক্সের' উপর গবেষণা, তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার তাঁর প্রবর্তিত 'শ্রোইডিঙ্গার ইকোয়েশন'। শংকারাচার্যের অদ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করে তাঁর লেখা 'বেসিক ভিউ অব বেদান্ত' বইটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

উদ্ধৃতি : বেদান্তের শিক্ষা হচ্ছে ব্রহ্মচেতনা এক ও অনন্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঘটনার উদ্ভব বিশ্বজনীন চেতনা থেকে এবং সেখানে মানুষে মানুষে বহুত্ব নেই।

উৎস : হোয়াট ইজ লাইফ? দ্য ফিজিক্যাল আস্‌পেক্ট অব লিভিং সেল, মাইন্ড অ্যান্ড ম্যাটার— এরউইন শ্রোইডিঙ্গার।

উদ্ধৃতি : তোমার এই যে জীবন যা তুমি উপভোগ করছো, তা একটা বিচ্ছিন্ন টুকরো ঘটনা নয়, বরং এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে তা হলো পূর্ণ। এবং এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমন নয় যে এক ঝলকে দেখে শেষ করা যাবে। এটাকেই প্রাচীন ঋষিরা বর্ণনা করেছেন বেদান্তের এক পবিত্র ও আধ্যাত্মিক সূত্রে, যা এত স্পষ্ট এবং সরল তা হচ্ছে : তত্ত্বমসি=তৎ ত্বম অসি (তুমিই সেই)। অথবা অন্য কথায়, আমি আছি পূর্বে, আমি আছি পশ্চিমে, আমি আছি উপরে, আমি আছি নীচে, আমি আছি সর্বত্র, পরিব্যাপ্ত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।

উৎস : মডেল অব ম্যান, মাইন্ড অ্যান্ড ম্যাটার,মাইন্ড অ্যান্ড মরালিটি। লেখক মার্টি মন্টেইরো।

বি: দ্র: বেদান্তের একতা এবং ধারাবাহিকতার সঙ্গে আধুনিক পদার্থবিদ্যার তরঙ্গতত্ত্বের আশ্চর্য রকমের মিল দেখা যায়। ১৯২৫ সালে পদার্থবিদ্যার ধারণা ছিল সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে এমন এক যন্ত্র যা গঠিত হয়েছে পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়াযুক্ত বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য পদার্থের সমষ্টির দ্বারা। এর কয়েক বৎসর পর শ্রোইডিঙ্গার, হাইসেন্‌বার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এবং তাঁদের সহযোগীরা এমন এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মডেলের সৃষ্টি করেছিলেন যা হলো 'প্রবাব্‌লিটি অ্যামপ্লিটুড' দ্বারা গঠিত অবিচ্ছেদ্য অনন্ত তরঙ্গমালার সমাপতনের ফল। এই নব্য আবিষ্কৃত মতবাদ বেদান্তের 'একের মধ্যেই সব' বা 'তাঁর মধ্যেই সব' বা 'সবের মধ্যেই তিনি' তত্ত্বের সঙ্গে ছিল সম্পূর্ণ ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড : (১৮৮৭-১৯৪৯)

পরিচিতি : তিনি ছিলেন আমেরিকার বিখ্যাত ভাষাবিদ এবং লেখক। তিনি ইন্ডো-ইউরোপিয়ান ভাষার উপর ভাষাগঠন সংক্রান্ত কাজ করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার গঠন, তার বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা, বিশুদ্ধতা এবং নির্ভুলতা দেখে অভিভূত হয়ে গেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম ছিল, 'ল্যাঙ্গুয়েজ'।

উদ্ধৃতি : এটা সত্য যে, ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারই ভাষাতত্ত্বের উপর ইউরোপিয় ধ্যানধারণায় বিপ্লব এনে দিয়েছিল। হিন্দু ব্যাকরণই ইউরোপবাসীদের ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে শিখিয়েছিল। তুলনা করলে দেখা যায়, সংযোজক শব্দগুলি আগে যেখানে অস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হতো, সেগুলি এখন অত্যন্ত সূক্ষ্মতা এবং সুস্পষ্টতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে।

উদ্ধৃতি : প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ, 'পাণিনি' এতই উন্নত ছিল যে, আজকের আধুনিক ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তার আর কোনও উন্নততর অবকাশ নেই। আজকে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বাক্যনির্মাণের জন্য যে কলা কৌশল আবিষ্কার করেছে, তা 'পাণিনির' প্রথম দুই ভাষ্যকার অনেক আগেই বিস্তৃত ভাবে লিখে গিয়েছিলেন। গণিতশাস্ত্রে ভারতের যে অভূতপূর্ণ অবদান শূন্যের ধারণা, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও তার বিশেষ ভূমিকা আছে।

উৎস : ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়া— সম্পাদক ও. এল. চ্যাভারিয়া— আগুইলার ব্যাকরণ অধ্যায়— লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড হল।

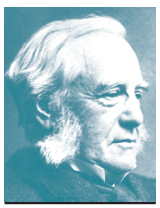

প্রফেসর, এফ. ম্যাক্স মুলার : (১৮২৩-১৯০০)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন জার্মানির অন্যতম বিশিষ্ট দার্শনিক, সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যিনি অসংখ্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার অন্বেষণ থেকে জানা যাবে পরবর্তীকালের ইউরোপীয় সভ্যতার উৎপত্তির ইতিহাস। সেই ধারণা থেকেই তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা এবং বেদের চর্চা শুরু হয়।

উদ্ধৃতি : সাত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, যখন দেখি বহু হাজার বৎসর পূর্বে, বৈদিক ঋষিরা তাদের অসামান্য প্রজ্ঞা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল যে বেদান্তের সৃষ্টি করেছিলেন, তা পড়তে গেলে আমাদের মাথা ঘুরে যায়, গোথিক ক্যাথিড্রালের দোদুল্যমান শেষ সিঁড়িটিতে পা রাখলে যেমন অনুভব হয় ঠিক তেমনি।

আমাদের দার্শনিকরা অর্থাৎ হেরাক্লিটাস, প্লেটো, কান্ট, হেগেলের মতো বিদ্বানরাও সাহস করবেন না সেইরকম উচ্চশিখর যুক্ত সৌধনির্মাণ করতে যেখানে বাত্যা-বিদ্যুতের কোনও আশঙ্কা নেই।

উৎস : দ্য সিক্স সিস্টেমস অব ইন্ডিয়ান ফিলোসফি— ম্যাক্সমুলার।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

ভারতীয় নারীর আর এক আদর্শ
মহারানী রুদ্রমাদেবী

অঙ্গনা

পারুল মণ্ডল সিংহ

ভারতীয় মহিলা সমাজের একটা বড় অংশ পাশ্চাত্যের ভোগবাদ আশ্রিত নারীবাদ বা বর্তমানকালের 'নয়া নারীবাদ' যা কেবল ইন্দ্রিয় সুখ, উদ্ধত আচরণ ও কেবল অধিকারবোধ তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে, তাকে কখনই নিজেদের আদর্শ বলে ভাবতে পারি না। ভারতীয় ঐতিহ্যের মানানসই নারীশক্তির উদাহরণ খুঁজতে হলে সেই বৈদিক যুগে ফিরে যেতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তখন উদাহরণ পাই যা হয়তো আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই হয় না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় ঐতিহ্যে নারীর সফলতার মাপকাঠি কেবলমাত্র বাহ্যিক জগতের উপলব্ধিতে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা, কলা, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক শক্তির পরিপূর্ণতা, বিভিন্ন প্রকার বিদ্যাতে তার পারদর্শিতা— তাকে একজন আদর্শ নারী হিসেবে গড়ে তোলে।

ভারতীয় ইতিহাসে এমন আদর্শ নারীর উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মেকলে ও মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চায় খুব যত্ন সহকারে সেই সকল নারীর ইতিহাসকে লোকসম্মুখে জনপ্রিয় করে তোলা হয়নি। এই ধরনের একজন নারী চরিত্রই হলেন মহারানি রুদ্রামাদেবী।

মধ্যকালীন ভারতবর্ষে, যখন দেশজুড়ে বর্বর সুলতানদের শাসন চলছে, তখন এদেশে হিন্দু এবং দুর্বলদের বেঁচে থাকাও নির্ভর করত শাসকদের অনুগ্রহের উপর। সমাজে মহিলাদের সম্মান ও স্থানকে নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুলতানি শাসনে মহিলারা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সমস্ত অধিকার হারিয়েছিলেন। তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করত পুরুষদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। হিন্দু মহিলারা মুসলমান শাসকদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে গৃহবন্দি হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সময়কালে নারী স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক হিসেবে রাজিয়া সুলতানার নাম আমরা ছোটবেলা থেকেই পাঠ্য বইতে পড়ে এসেছি। তিনি ওই সময়কার পুরুষতান্ত্রিক অন্ধকার যুগেও দেশের শাসক পদে বসেছিলেন এবং ১২৩৬ থেকে ১২৪০ পর্যন্ত অত্যন্ত অল্পকালের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন।

রাজিয়া সুলতানার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু তাঁর চার বছরের অসফল শাসনকালকে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচয়িতারা তখন গৌরবোজ্জ্বল ভাবে পরিবেশন করলেও প্রায় একই সময়কালে দক্ষিণ ভারতের বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের কাকতীয় রাজবংশের মহারানি রুদ্রামাদেবীর দীর্ঘকাল সফল দেশচালনার গৌরবময় অধ্যায়কে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

রুদ্রমাদেবী দক্ষিণ ভারতের রাজবংশের অন্যতম সাম্রাজ্ঞী ছিলেন। তাঁর পিতা গণপতিদেবের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি শাসন কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং ১২৩৬ সাল থেকে স্বাধীন সার্বভৌম সাম্রাজ্ঞী হিসেবে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন ইতিহাসের বিরলতম নারী শাসিকাদের মধ্যে অন্যতম। কারণ একজন যথার্থ সম্রাট হতে গেলে যা যা গুণাবলীর অধিকারী হতে হয় তা সে যতই পুরুষোচিত হোক না কেন, তা তিনি সমস্ত অর্জন করেছিলেন। তাই অনেক সময় তাঁকে 'মহারাজা রুদ্রদেব' রূপেও সম্বোধন করা হতো। তিনি ভারতের নারী শাসিকাদের মধ্যে অন্যতম কনিষ্ঠ শাসিকাও ছিলেন। ১২৬৩ সাল থেকে আমৃত্যু (১২৪৭ মতান্তরে ১২৯৫ খ্রিস্টাব্দ) তিনি কাকতীয় বংশের সাম্রাজ্ঞী ছিলেন। তার আমল পর্যন্ত সুলতানি শাসকগণ কাকতীয় অধিকার করতে পারেনি।

তিনিই প্রথম রাজ্যের সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজান। অভিজাত- বংশীয় নয়, কিন্তু দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সেনাবাহিনীতে উঁচু পদ দেন এবং পুরস্কার স্বরূপ তাদের জমির উপর অধিকার প্রদান করেন। এই উদ্যোগ পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরীরা এমনকী বিজয়নগরের শাসকরা পর্যন্ত অনুসরণ করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিও জয় করেন। দেবগিরির যাদববংশীয়রা এবং চোলরা কাকতীয় সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালালেও রানি রুদ্রমাদেবীর সফল নেতৃত্বে চোল ও যাদবরা পিছু হটতে বাধ্য হন। তিনি কাকতীয়দের রাজধানী গুরুগুল্লু (পরবর্তীকালের বারাঙ্গাল)-তে বিশাল দুর্গ নির্মাণ করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বিখ্যাত গোলকুণ্ডা দুর্গের নির্মাণ কাজও তিনি শুরু করেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের প্রতিটা বিদ্রোহ দমন করেন। ভূ-পর্যটক মার্কোপোলো তাঁর সময়কালের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁর শাসনকে ন্যায়, সাম্য, শান্তিতে ভরিয়ে তুলেছিলেন। অন্ধ্রের ইতিহাসে তাঁর শাসনকালে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

রুদ্রমাদেবী সমস্ত ভারতীয় মহিলার আদর্শ চরিত্র। বৈদিকসূত্রের মহান মহীয়সী নারীগণ, রুদ্রমাদেবী, রানি লক্ষ্মীবাঈ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের প্রত্যেকটি আধুনিক ও সফল নারীই প্রমাণ করেছেন যে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, কঠোর অনুশাসন, ধৈর্য, সাহস, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান ও বিনয় এবং সর্বোপরি চারিত্রিক দৃঢ়তাই প্রকৃত সফলতা ও স্বাধীনতা এনে দেয়। ■

চৈত্রমাসের কৃষি কাজ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

পাট :

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিতাপাটের জলদি জাতগুলি বোনা যাবে। ফাল্গুনের শেষ থেকেই তা বপন শুরু হয়ে যায়। তবে তিতাপাটের প্রধান ফসল পরে বুনতে হবে; এই বপন পর্ব চলবে পুরো চৈত্র মাস এবং বৈশাখের মাঝমাঝি পর্যন্ত। পক্ষান্তরে মিঠাপাট বোনা হয় একটু দেরিতে। মিঠাপাটের জলদি ফসল চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ থেকে বৈশাখের মাঝমাঝি অবধি বোনা যায়। তার প্রধান ফসল বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা সম্ভব।

তিতা ও মিঠাপাটের জন্য বীজের হারে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিঘা প্রতি জমিতে তিতাপাটে ১ কেজি এবং মিঠাপাটে ৮০০ গ্রাম বীজ লাগে। বোনার আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। এজন্য প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম পরিমাণ কার্বেন্ডাজিম অথবা ২ গ্রাম থাইরাম মিশিয়ে দিতে হবে।

তিতাপাটের উন্নত জলদি জাত হলো সোনালি। তিতাপাটের প্রধান ফসলরূপে শ্যামলী, সবুজসোনা ইত্যাদি জাত উল্লেখযোগ্য। মিঠাপাটের উন্নত জলদি জাত হচ্ছে চৈতালি তোষা। মিঠাপাটের প্রধান ফসলরূপে সুবর্ণ জয়ন্তী তোষা, বাসুদেব, নবীন ইত্যাদি বোনা যায়।

পাটের জমি তৈরি করতে শেষ চাষের সময় বিঘা প্রতি ১০-১২ কুইন্টাল জৈবসার মেশাতে হবে। আর দিতে হবে মোট নাইট্রোজেনের এক তৃতীয়াংশ। ফসফেট ও পটাশ সারের পুরো ভাগটাই সেই সঙ্গে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। তিতাপাটে বিঘা প্রতি ৮, ৪ এবং ৪ কেজি নাইট্রোজেন, ফসফেট আর পটাশ লাগে। মিঠাপাটে লাগে যথাক্রমে ৭, ৩ এবং ৩ কেজি পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ। এই নাইট্রোজেনের এক-তৃতীয়াংশ শেষ চাষে দেওয়ার কথা।

যারা ফাল্গুন মাসের শেষ দিকে তিতাপাট বোনার সুযোগ পেয়েছেন, তারা পাটের চারা বের হবার দু' সপ্তাহের মধ্যে চার ইঞ্চি তফাতে এক একটি গাছ রেখে বাকিগুলি তুলে ফেলুন, তাতে গাছের বৃদ্ধি ভালো হবে। এই কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মাঝের ঘাসগুলিও নিড়ান দিয়ে তুলে ফেলুন।

এছাড়া বীজ বোনার একদিন পর আগাছা-নাশক ফ্লুকোরোলিন ৪৫ শতাংশ (ব্যাসালিন) প্রতি লিটার জলে ৬ মিলি পরিমাণ মিশিয়ে প্রতি বিঘার জন্য ২৭ লিটার ওষুধ-গোলা জল স্প্রে করলেও আগাছার উৎপাত ঠেকাতে পারবেন।

চৈত্র মাসের ডালশস্য চাষ :

মুগ :

প্রাক্-খরিফ বা গ্রীষ্মকালীন মুগ চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা যায়। এই বীজ বোনার সূত্রপাত ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময় থেকে। ভালো জাত হচ্ছে সোনালি, পান্না প্রভৃতি। বিঘা প্রতি ৪-৫ কেজি বীজ লাগবে। বীজের সঙ্গে মেশাতে হবে নির্দিষ্ট প্রকারের জীবাণু সার রাইজোবিয়াম। জমি তৈরির সময় দিতে হবে বিঘা প্রতি ৩ কেজি নাইট্রোজেন বা ৭ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি ফসফেট বা ৩১ কেজি এসএসপি এবং ৫ কেজি পটাশ বা ৮ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ সার; আর দিতে হবে উপযুক্ত পরিমাণ জৈব সার। মুগ বোনার তিন সপ্তাহ পর আগাছা দমন করতে হবে। তুলে ফেলতে হবে অতিরিক্ত এবং দুর্বল চারা। বোনার একমাসের কিছু আগে একটি হাল্কা সেচ দরকার।

কলাই :

চৈত্র মাসে প্রাক্-খরিফ ফসল হিসেবে কলাই বোনা যায়। এই বোনার কাজ শুরু হয়ে যায় ফাল্গুনের মাঝমাঝি থেকেই। বীজ লাগবে বিঘাতে সাড়ে তিন কেজি (ছিটিয়ে বুনতে) থেকে তিন কেজি (সারিতে বুনলে)। বীজ শোধন করে নিতে হবে। এজন্য প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম পরিমাণ থাইরাম বা ২ গ্রাম পরিমাণ কার্বেণ্ডাজিম মেশাতে হবে। কলাই-এর উন্নত জাতগুলি হলো কালিন্দী, সারদা, বসন্ত বাহার, আজাদ ইত্যাদি। বীজের সঙ্গে নির্দিষ্ট জীবাণু সার রাইজোবিয়াম মিশিয়ে বোনা ভালো। শেষ চাষের সময় মুগে সুপারিশকৃত সার প্রয়োগ জরুরি।

রামনবমীর জনজোয়ার হিন্দুসমাজের অবদমিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ

সাধন কুমার পাল

২০১৮ সালের রামনবমী পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে বিশেষ দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। যারা এতদিন নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারক বাহক খাঁটি বাঙালি সংস্কৃতির ব্র্যান্ড হিসেবে জাহির করে গলার শিরা ফুলিয়ে বলত 'বাঙালির সংস্কৃতিতে এসব নেই', 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি', 'এ বাংলায় এসব হয় না', বাংলা বাংলা বলে কৌলিন্য জাহির করায় চাম্পিয়ন তৃণমূল কংগ্রেস এবার দলীয় ব্যানার নিয়ে রামনবমী পালন করতে পথে নামল। দলের সঙ্গে যুক্তরা হিন্দু হিসেবে ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও, পার্টির ব্যানার নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি কখনো কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেছে এমন নজির নেই। কিন্তু সমগ্র ভারতেই পরিস্থিতি এমনই যে, যেখানেই গেরুয়া রং, হিন্দুদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, সেখানেই ধর্মনিরপেক্ষতার কারবারিরা বিজেপির ছায়া দেখতে পাচ্ছে। ফলে নির্বাচন এলেই এখন হিন্দুত্বের নামে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠা সেকুলার নেতারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মন্দিরে ছুটছেন, গেরুয়া পরছেন, কপালে রক্তচন্দন লেপে নিচ্ছেন। তবে বিজেপি পালের হওয়া কাড়তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক ধাপ এগিয়ে গোটাদলকে নামিয়ে দিয়েছেন রামনবমীর ধর্মীয় মিছিলে। আগামীদিনে হয়তো সমগ্র ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরেই এই দৃশ্য দেখা যাবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের এই রামভক্তি দেখে ছোটবেলায় শোনা রামায়ণের একটি গল্প মনে পড়ছে। সেতুবন্ধনের কাজ চলছে। সে এক অভাবনীয় কর্মকাণ্ড। হই হই কাণ্ড রই রই ব্যাপার। হাওয়ায় খবর ছড়াচ্ছে চারদিকে। রামনামে জলে ভাসছে পাথর, শুধু নর-বানর নয়, কাঠবিড়ালির মতো ক্ষুদ্র প্রাণীও শামিল হয়েছে এই বিরাট কর্মযজ্ঞে। লঙ্কায় পৌঁছে গেল সেই খবর। লঙ্কা নিবাসীরা রাবণকে গিয়ে ধরল, প্রভু শোনা যাচ্ছে রামনাম করে বানরসেনারা পাথর সমুদ্রে নিক্ষেপ করছে, সেই পাথর জলে ভাসছে। আমরা দেখতে চাই আপনার মধ্যেও এই রকম অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানোর ক্ষমতা আছে। খানিক ভেবে রাবণ নিজের ক্ষমতা দেখানোর উদ্দেশ্যে অনুগামীদের নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো। অনুগামীদের হাত থেকে পাথর নিয়ে রাবণ সেই পাথর নিজের কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করলো। দেখা গেল সেই পাথরও জলে ভাসছে। এই ভাবে দু'তিনটে পাথর ভাসিয়ে রাবণ গম্ভীর হয়ে প্রাসাদে ফিরে একেবারে অন্দরমহলে নিজের ঘরে গিয়ে বসে পড়লো। রাবণের কপালে ভাজ, চেহারায় দুশ্চিন্তা অবসাদের ছাপ। তবুও একা থাকার কী উপায় আছে! পাথর জলে ভাসার মতো অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হলো, বিড়বিড় করে কী মন্ত্র করছিলেন, এই অসম্ভব কাজের ফলে শরীর খারাপ করলো কিনা এমন হাজারো প্রশ্ন নিয়ে হাজির মহারানি মন্দোদরী। অবশেষে রাবণ মহারানি মন্দোদরীর কাছে খোলসা করলেন সমস্ত রহস্য। বললেন, বুঝলে এটা গুজব নয়, আমিও পাথর কপালে ঠেকিয়ে রাম নাম জপ করে সেটিকে জলে নিক্ষেপ করে দেখলাম সত্যিই সেটা জলে ভাসছে।

তৃণমূল কংগ্রেস যতই রামনবমী, হনুমান জয়ন্তীর সস্তা চমক দেখাক না কেন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ভুক্তভোগী হিন্দু জনতা কিন্তু প্রশ্ন তুলছেই— পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের নিরাপত্তা, বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের নাগরিকত্ব, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ, সীমান্তে গোরুপাচার, রামমন্দির নির্মাণ, গোহত্যা বন্ধ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নীরব কেন?

তৃণমূলনেত্রী এবার স্লোগান তুললেন 'রাম কারো একার নয় রাম সবার'। দেশ জুড়ে এমনকী নিজের রাজ্যেও রামের নামে জনপ্লাবনের দৃশ্য দেখে রাবণের মতো অনুগামীদের বায়নাতেই হয়তো তৃণমূলনেত্রী এবার রামনবমীতে রামের নামে জমায়েত করে বিজেপির পালের হাওয়া কেড়ে নিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে চেয়েছিলেন। কোথাও নীল রঙের পতাকা, কোথাও সাদাপতাকা আবার কোথাও নীল সাদা। রামের নামে শোভাযাত্রা হলেও নেত্রীর নামে জয়ধ্বনি উঠল শোভাযাত্রা থেকে। রাবণ রামের নাম করে অনুগামীদের মন ভরাতে পারলেও, মমতা কিন্তু পারলেন না রামের নামে ভিড় জমিয়ে টেক্কা দিতে। হিন্দুসমাজের যে শোভাযাত্রাগুলিকে মমতা বিজেপির শোভাযাত্রা বলে চিহ্নিত করলেন, ভিড় উপচে পড়লো সেইগুলিতে। পরিসংখ্যান বলছে শুধু মাত্র উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেই তৃণমূল কংগ্রেসের হুমকি ধমকি উপেক্ষা করে ছ'লক্ষের বেশি মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। এতে

বেজায় চটে যান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে প্রকাশ্যে নির্দেশ দেন শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হলেও প্রতীকী অস্ত্র ধারণের জন্য মামলা করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর আরও হুমকি— যে সমস্ত পুলিশ মামলা করতে শিথিলতা দেখাবে সেই সমস্ত পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ফলে নিরুপায় পুলিশ সর্বত্রই মামলা করছে। উত্তর দিনাজপুরের ঈশ্বরপুরে (ইসলামপুর) বিগত কয়েক বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ রামনবমীর শোভাযাত্রায় শামিল হন। এবারও তিন লক্ষ রামভক্ত হেঁটেছে ঈশ্বরপুরের রাস্তায়। সেই উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধেও মামলা করেছে পুলিশ।

প্রশ্ন হচ্ছে, রামনবমী উপলক্ষে এই জনপ্লাবনের কারণ কী? একটু খোঁজ করলেই স্পষ্ট হবে যে অহেতুক রামভক্তি নয়, রামনবমীকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের অবদমিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। হিন্দুরা যাদের ভগবান বলে শ্রদ্ধা করে সেই শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে মসজিদ। গোহত্যাকারী, গোমাংস ভক্ষণকারীরা এখনো এদেশে সবচেয়ে প্রগতিশীল কুসংস্কার মুক্ত মানবগোষ্ঠীর মর্যাদা পায়। এই নিয়ে কথা বললেই জুটছে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক তকমা। মুসলমান বা খ্রিস্টানদের সমস্যা নিয়ে কথা বলা এদেশে উদার ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচায়ক। তথাকথিত সংখ্যালঘুদের অত্যাচারে হিন্দু উদ্বাস্তু (উদাহরণ কাশ্মীরি পণ্ডিত) হলে সাম্প্রদায়িক তকমা লাগার ভয়ে কেউ মৌখিক প্রতিবাদটুকু করার সাহস পায় না। অথচ কোনও মুসলমান হিন্দু মহল্লায় বাড়ি ভাড়া খুঁজে না পেলে এই ইস্যু নিয়ে টিভিতে টক শো শুরু হয়ে যায়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ একবার বলেছিলেন এদেশের সম্পদের উপর সংখ্যালঘুদের প্রথম অধিকার। প্রকৃতপক্ষে ভারতে হিন্দুদের অবস্থা স্বভূমে পরবাসীর মতো। অযোধ্যায় বিতর্কিত ধাঁচা ধ্বংসের সময় জনসুনামী কিংবা রামনবমীর শোভাযাত্রায় জনপ্লাবন এই সবই হিন্দুসমাজের অবদমিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

তৃণমূল কংগ্রেসের রামনবমীতে মানুষ সাড়া দেয়নি, রাহুল গান্ধী মন্দির ঘুরে কপালে চন্দন লাগিয়েও গুজরাট নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি। অযোধ্যা, মথুরা, গোহত্যা, নাগরিকত্ব, অনুপ্রবেশ হিন্দু সমাজের এই সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট না করে লোক দেখানো রামনবমী হনুমান জয়ন্তী পালন করলেই কিংবা ভোটের আগে তিলক কেটে মন্দিরে গেলেই যে হিন্দু সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে গেরুয়াধারী রাবণদের পিছনে ছুটবে না— এটা তারই প্রমাণ।

বাংলা সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠী কোন্দল বলে চেপে গেলেও সর্বভারতীয় হিন্দি ও ইংরেজি সংবাদমাধ্যমগুলির দৌলতে আমরা রানিগঞ্জ ও আসানসোলে রামনবমীর নিরস্ত্র শোভাযাত্রায় জেহাদি হামলার বৃত্তান্ত জেনেছি। দার্জিলিংয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়ে রাজ্য পুলিশের উপর ভরসা না রেখে সেনা মোতায়নের দাবি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু লাগাতার তিনদিন ধরে জেহাদি হামলা ও তার জেরে হিন্দুরা ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র পালাতে থাকলেও রানিগঞ্জ ও আসানসোলে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের জন্য কেন্দ্রের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করলেন। ধুলাগড়, কালিয়াচকের মতো রানিগঞ্জ ও আসানসোলের হিন্দুদের জেহাদি তাণ্ডবের মুখে ফেলে রেখে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে তিনি স্বয়ং দিল্লিতে পড়ে রইলেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নানারকম ব্যাখ্যা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর এই অস্বাভাবিক আচরণের। এই সমস্ত ব্যাখ্যার সার কথা রামের নামে ভিড় জমিয়ে রামনবমী হাইজ্যাক করতে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুদের মজা শেখাচ্ছেন। রামনবমীর রেশ না কাটতেই তৃণমূলের মহাসচিব ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জী ঘোষণা করেছেন দল হনুমান জয়ন্তীও পালন করবে। তৃণমূল কংগ্রেস যতই রামনবমী, হনুমান জয়ন্তীর সস্তা চমক দেখাক না কেন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ভুক্তভোগী হিন্দু জনতা কিন্তু প্রশ্ন তুলছেই— পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের নিরাপত্তা, বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের নাগরিকত্ব, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ, সীমান্তে গোরুপাচার, মুসলমান অনুপ্রবেশ, রামমন্দির নির্মাণ, গোহত্যা বন্ধ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নীরব কেন?

অহিন্দুদেরও প্রশ্ন তুলতে শোনা যাচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস কি এবার ব্যানার লাগিয়ে মহরমের মিছিল বা ঈদের নমাজ, যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালন করবে? এই প্রশ্নগুলি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তৃণমূলের সাধারণ কর্মীরাও তুলছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কিন্তু বলছেন সবাইকে খুশি করতে গিয়ে ওই গাধার মালিককে যেমন বাপ-ব্যাটা মিলে গাধাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল অতি চতুর তৃণমূল কংগ্রেসের সেই অবস্থা না হয়। ■

স্বস্তিকা ৭০ বছর পূর্তি

ও

বাংলা নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান

১৪ এপ্রিল ২০১৮ (বাংলা ৩০শে চৈত্র, ১৪২৪) শনিবার

স্থান : সুবর্ণ বণিক সমাজ হল

৪৭, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩

সময় : বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট

প্রধান বক্তা : ইন্দ্রেশজী, সংযোজক, রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ

স্বস্তিকার লেখক, পাঠক-পাঠিকা, প্রচার প্রতিনিধি, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

কমনওয়েলথ গেমসের সালতামামি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুইন্সল্যান্ডের সৈকত শহর গোল্ড কোস্টে আয়োজিত কমনওয়েলথ গেমস এক নান্দনিক চেতনার সঞ্চার করতে চলেছে ৮০টি দেশের অ্যাথলিট, পরিচালক ও কর্মকর্তাদের মননে। এই গেমস যেমন একদিকে স্বর্গীয় আনন্দের পরশ দেবে, তেমনি রেকর্ড ভাঙাগড়ার দিক থেকেও অনন্যসাধারণ উচ্চতায় উঠে যাবে। যেহেতু অস্ট্রেলিয়াকে বলা হয় গোটা বিশ্বের 'স্পোর্টিং ক্যাপিটাল', তাই সে দেশের খেলাপ্রিয় জনতার সামনে জীবনের সর্বোত্তম পারফরমেন্স করার স্বাদ ও মাধুর্যই আলাদা। এই জায়গা থেকে বলা চলে গোল্ড কোস্ট কমলওয়েলথ গেমস সবদিক থেকেই ব্যতিক্রমী শো হয়ে দাঁড়াবে। কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত ৮০টি দেশের সাড়ে সাত হাজার অ্যাথলিট এই গেমসে অংশগ্রহণ করছে। তার সঙ্গে ১৭টি খেলার পরিচালক ও কর্মকর্তা মিলিয়ে আরও আড়াই হাজার ব্যক্তিত্ব। সব মিলিয়ে এক রাজসূয় যজ্ঞ। বিশাল গেমস ভিলেজে এই দশ হাজার ক্রীড়া ও শরীরচর্চার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন ছাড়াও থাকার ব্যবস্থা আছে তিন হাজার সংবাদ প্রতিনিধির।

সংযুক্ত কমনওয়েলথ গেমসের ভাবনার জন্ম গত শতকের গোড়ার দিকে। ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনে থাকা সমস্ত দেশকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাকিংহাম প্যালেস এই ধরনের বৃহৎ কর্মযজ্ঞ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। হাউস অব লর্ডসের বরিষ্ঠ তাত্ত্বিক রেভারেন্ড অ্যাস্টলে কুপার, এক খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন সম্রাট পঞ্চম জর্জের কাছে। সম্রাট সেটি রাজসভা, পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে নেন। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে প্রতি চারবছর অন্তর কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হবে ইংল্যান্ড-সহ সমস্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দেশগুলির প্রধান শহরে। প্যান ব্রিটানিক তথা প্যান অ্যাংলিকান উৎসব হিসেবে

কমনওয়েলথ গেমসকে মর্যাদাব্যঞ্জক সিলমোহর দেওয়া হয় হাউস অব লর্ডস ও হাউস অব কমন্সে। এরপর যাবতীয় কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন করে তাকে বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়া হয় কানাডার মাটিতে।

১৯৩০ সালে আত্মপ্রকাশ করে প্রথম কমনওয়েলথ গেমস। কানাডার শহর হ্যামিলটনে যা কিনা অন্টারিও প্রদেশের রাজধানী, প্রথম গেমস আয়োজন করা হয়। ইংরেজ রাজশক্তির বরাবরের প্রিয় কানাডা। তাই নিজেদের দেশে না করে কানাডাকে প্রথম কমলওয়েলথ গেমস আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কানাডার তৎকালীন কিংবদন্তী অ্যাথলিট ববি রবিনসন ছিলেন গেমস আয়োজনের চালিকা শক্তি। ১১টি দেশের প্রায় ৪০০ অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করেছিলেন। সমস্ত অ্যাথলিট ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন হ্যামিলটনের আয়োজক কমিটি। প্রথম গেমসে অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, রোয়িং বক্সিং, কুস্তি, লন বোলিং ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম গেমসের সাফল্যমণ্ডিত জয়যাত্রা দেখে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার এসে যায় অন্যান্য দেশে।

১৯৬২-তে মেলবোর্ন কমনওয়েলথ গেমসে রচিত হয়েছিল ২৫টি কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ড এবং ১০টি বিশ্বরেকর্ড। চার বিগপাওয়ার ইংল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে তুল্যমূল্য লড়াই হয়েছিল সব খেলায়। হকি ওই গেমসেই প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অবিসংবাদী বিশ্ব শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ভারত সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দেশকে দুরমুশ করে সোনা জিতে নেয়। বিশ্ববন্দিত অ্যাথলিট মিলখা সিংহের দৌড় দেখার জন্য গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন কমনওয়েলথ হেড অব স্টেট স্বয়ং রানি এলিজাবেথ। ঐতিহাসিক দৌড়ে সোনা জিতে মিলখা সিংহ আমন্ত্রণ পান রয়্যাল বক্সে তাঁর সঙ্গে করমর্দনের। ওই গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রয়্যাল ডিনারেও আমন্ত্রিত সব বিশ্বতারকাদের মধ্যে ছিলেন মিলখা ও ভারতীয় হকি দল। ভারতে প্রথম কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে দিল্লিতে। ৭৭টি দেশ অংশ নিয়েছিল। বরাবর অন্যান্য দেশে আয়োজিত গেমসে ৫/৬ নম্বরে থাকা দেশ ভারত নিজের দেশে চমকপ্রদ পারফরমেন্স করে অস্ট্রেলিয়ার পরে, ইংল্যান্ডের আগে দুনম্বর স্থানে উঠে আসে।

এবারেও গোল্ড কোস্টে ভারত বেশ বড় দল পাঠিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, কানাডা শুধু কমনওয়েলথ পরিসরেই নয়, বৃহত্তম আন্তর্জাতিক দুনিয়ার প্রেক্ষিতেও বড় শক্তি। ভারতের লড়াই মূলত নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, মালয়েশিয়ার সঙ্গে। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড, হকি, সাঁতার এই তিন ইভেন্টের মানে কমনওয়েলথ গেমস নিঃসন্দেহে বিশ্বে প্রথম সারিতে থাকবে। বহু কীর্তিমান অ্যাথলিট, সাঁতারু কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চ থেকে উঠে এসে বিশ্ব বৃত্তে আলো ছড়িয়েছেন। কেনিয়ার মানুষের কাছে যিনি অ্যাঞ্জেলতুল্য সেই হেনরি রোনো সত্তর দশকে কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতে বলেছিলেন 'জীবনের নবজন্ম হলো'। এরপর দশ বছর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে দূরপাল্লার দৌড়ে রাজত্ব করেছিলেন হেনরি যার ভিত্তিপ্রস্তর রচিত হয়েছিল কানাডার ভিক্টোরিয়াতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে। ■

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাঁথি জেলার জেলা শারীরিক প্রমুখ সুভাষ কাণ্ডারের বাবা হৃষীকেশ কাণ্ডার আদাবেড়িয়ার বাড়িতে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কাঁথি নগর ব্যবস্থাপ্রমুখ বিকাশ মাইতির বাবা মৃণালকান্তি মাইতি গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া জেলার ছয়ানি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক কানাইলাল

মাইতি গত ২০ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা উত্তর বিভাগের সহ- ব্যবস্থাপ্রমুখ পারসজীর

পিতৃদেব তেজকরণ সেঠিয়া গত ২৪ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার পূর্বতন জেলা কার্যবাহ, বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহের পিতৃদেব দীপক কুমার গুহ গত ২৩ মার্চ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে কাপাসডাঙ্গার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও ১ নাতি রেখে গেছেন।

* * *

গত ১৮ মার্চ দিনহাটা নগর সঙ্ঘচালক

কল্যাণ কুমার পালের পিতৃদেব হারানচন্দ্র পাল ৯৯ বছর বয়সে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পুত্র, চার কন্যা ও জামাতা-সহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি দিনহাটা নগরের সঙ্ঘশাখার প্রথম সারির স্বয়ংসেবক। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। দিনহাটা মদনমোহন পাড়া সারদা শিশুতীর্থ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

* * *

গত ২৪ মার্চ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া জেলার সাংগঠনিক সম্পর্ক প্রমুখ পুর্ণেন্দু দত্তর পিতা গণেশ দত্ত তৃণমূলের কিছু নেতা এবং পৌরসভার কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁর নির্মীয়মাণ বাড়ির কিছু অংশ বেআইনি ভাবে বাড়ানো হয়েছে— এই অভিযোগে পৌরসভার কর্মীরা তার বাড়ি ভাঙতে শুরু করে। গণেশবাবু বাধা দিতে গেলে তাঁকে ছাদের উপর থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওই হামলাকারীদের সঙ্গে এখন আইনি লড়াই চলছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। উল্লেখ্য, তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুতে সবাই শোকস্তব্ধ। তিনি স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ, এক কন্যা ও দুই নাতনি রেখে গেছেন। □

পুরাণ থেকে শিক্ষা

মা, তুমি কি জানো মানুষের দেহের আকৃতি ক্রমশ কমে আসছে? মানুষের দেহ ছোট হয়ে আসছে। আগে নাকি মানুষের শরীর ছিল বড়। টিপু সুলতানের তরোয়াল দেখেছি মা, কী বিশাল। কী তার ওজন। সেটা আজকাল একটা

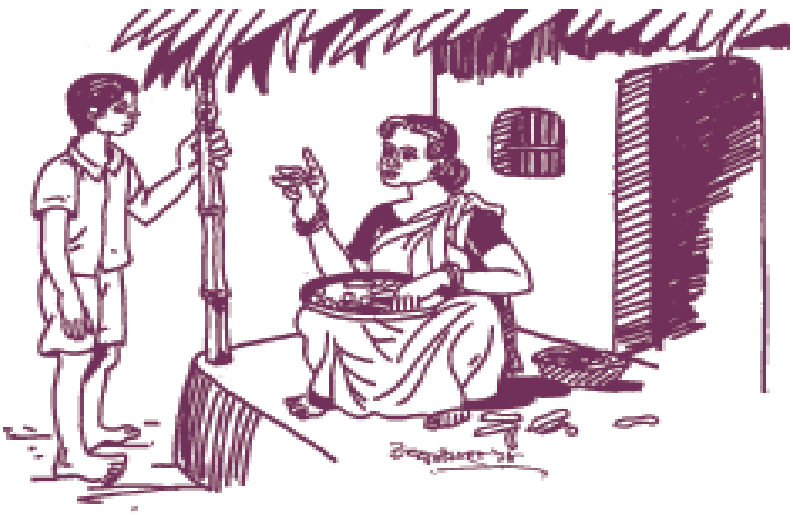

মানুষের পক্ষে তোলাই সম্ভব নয়, যুদ্ধ তো কোন ছাড়।

মা এক মনে করাইশুটি ছাড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে ছেলের দিকে তাকাচ্ছেন।

ছেলে বললো, মা জানো, ডারউইন বলে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি আমার প্রেরণা। তিনিই প্রথম ইভলুশনের কথা বলেন। তিনি বলেন, যে লড়াইতে জিতবে সেই পৃথিবীতে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে। না হলে ম্যামথ, বা ডাইনোসরের মতো অতিকায় প্রাণী পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে, বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

মা, জানো আমি ডি এন এ নিয়ে রিসার্চ করবো। আমি আমেরিকায় যাবো। আমাকে লোকে বলবে আমি একজন জেনেটিক বিজ্ঞানী। ডারউইনের ইভলুশন নিয়ে আরো রিসার্চ করবো।

ও মা, তুমি ডারউইনের নাম শুনেছ?

মা বললো, হ্যাঁ আমি জানি ডারউইনের কথা। কিন্তু তুই কি জানিস বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা?

ছেলে মাথা নাড়লো। না, সে শোনেনি। ইংরেজি পড়াশোনায় সিলেবাসে এসব নেই।

মা বললেন, বেশ তাহলে শোন যেটা তুইও জানিস না, ডারউইন সাহেবও জানেন না। মন দিয়ে শোন।

বিষ্ণুর প্রথম অবতার হলো মৎস্য। অর্থাৎ মাছ। আমরা জানি জীবন শুরু হয়েছিল জলে। ঠিক কিনা?

ছেলে এবার অবাক চোখে তাকালো মায়ের দিকে। মা বলে চললো।

এরপর কূর্ম অবতার। অর্থাৎ কচ্ছপ। জল থেকে জীবনের বিচরণ শুরু হলো ডাঙায়। কচ্ছপ। উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়ানস্। ইভলুশন হলো সমুদ্র থেকে ডাঙায়।

এরপর বরাহ অবতার অর্থাৎ বন্য জন্তুজানোয়ার। বরাহ হলো বিশালদেহি শুকর। তাদের বুদ্ধির কোনও বিকাশ নেই। ধরা যেতেই পারে ম্যামথ বা ডাইনোসরের কথা এখানে বলা হয়েছে।

চার নম্বর অবতার হলো নৃসিংহ। যিনি আসলে প্রথম মানুষ। যার আকৃতি মানুষের মতো এবং মুখমণ্ডল সিংহের মতো। ব্যবহারও একটু জন্তুর মতো। মানুষের প্রথম প্রকাশ। তখনো মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটেনি। তখন ছিল হিংস্র। অসামাজিক।

পঞ্চম হলো বামন অবতার। তখন এক শ্রেণীর মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে। তারা অন্য শ্রেণীর মানুষ। যারা হিংস্র তাদের থেকে খর্বকায়। অর্থাৎ বেটে। অসভ্য মানুষ হলো হোমো ইরেকটাস। আর ছোট্ট দেহি বুদ্ধিমান মানুষ হলো হোমো ইরেকটাস। ক্রমশ হোমো স্যাপিয়েন্স যুদ্ধে জিতল। এবং পৃথিবী দখল করলো।

ষষ্ঠ অবতার হলো পরশুরাম। এই মানুষের হাতে ছিল কুঠার। অর্থাৎ যে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে শুরু করে। গুহাতেও বসবাসের ব্যবস্থা করে। রাগী। এবং অসামাজিক।

সপ্তম অবতার হলো রাম। প্রথম বুদ্ধি বিবেচনা যুক্ত মানুষ। ইনি হলেন সামাজিক। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলো। আইন, কানুনের সৃষ্টি হলো। সৃষ্টি হলো সমাজেরও। তৈরি হলো মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক।

অষ্টম অবতার বলরাম। যিনি আসলে চাষ আবাদ শুরু করলেন। কৃষি কার্য শুরু হলো মানুষের স্বার্থে।

নবম অবতার বুদ্ধ। সৃষ্টি হলো প্রেমধর্মের। প্রেমধর্ম মানুষকে দেখালো কীভাবে শান্তিতে বেঁচে থাকতে হয়।

শেষ অবতার কল্কি। তিনি এখনো আসেননি। তিনি হবেন জেনেটিক্যালি অনেক অনেক উন্নত এক মানুষ। তার আসাটাই আর একটা ইভলুশনের দরকার। কর্কট রোগের অতিরিক্ত কোষ বিভাজনই নাকি তার প্রারম্ভ। অর্থাৎ সেই জেনেটিক ইভলুশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

মা, এ তো আশ্চর্য! ছেলে বলে উঠল। আমি তো ভাবতেই পারছি না যে ডারউইনের অনেক আগেই পুরাণে এসব লেখা আছে।

মা বললেন, হ্যাঁ আছে। আসলে ভারতীয়রা ভাবতে জানে, আবিষ্কারও করতে জানে। কিন্তু তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় লিখতে জানে না। তারা এইসব আবিষ্কারকে পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই পুরাণ সঠিক ভাবে পড়তে পারলে দেখা যাবে ভারতীয়রা যা বহুকাল আগে ভেবে ফেলেছে, তা বিদেশিরা আজ ভাবতে শুরু করেছে। *(সংগৃহীত)*

ভারতের পথে পথে

দেওঘর

ঝাড়খণ্ড রাজ্যে সাঁওতাল পরগনা জেলার দেবগৃহের বর্তমান নাম দেওঘর। বৈদ্যনাথধাম নামেও খ্যাত। ৭২ ফুট উঁচু মন্দিরে দেবতা কামনা-লিঙ্গ এখানে বৈদ্যনাথ নামে বিখ্যাত। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরটি নির্মাণ করান ১৫৯৬ সালে রাজাপূরণমল। চাকবন্দি ও গোলাকার মন্দিরে সন্ধ্যায় স্নানাভিষেকের সময় বিগ্রহ দর্শন করা যায়। শ্রাবণমাসে ১০০ কিলোমিটার দূরের গঙ্গা থেকে জল এনে পুণ্যার্থীরা স্নান করান বিগ্রহকে। এছাড়াও এখানে তপোবন, নওলাক্ষি মন্দির, দেবী কুণ্ডেশ্বরী, নবদুর্গামন্দির দর্শনীয় স্থল।

জানো কি?

- জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দেওয়া হয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে।
- অর্জুন পুরস্কার—খেলাধুলার ক্ষেত্রে।
- চামেলীদেবী জৈন পুরস্কার—সংবাদমাধ্যমে মহিলাদের জন্য।
- গ্রামি অ্যাওয়ার্ড—সঙ্গীতে।
- বুকার পুরস্কার—সাহিত্যে।
- অশোকচক্র—সামরিক ক্ষেত্রে।
- বীর সাভারকর পুরস্কার—বিজ্ঞানে।
- পরমবীর চক্র—সামরিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান।
- কবির অ্যাওয়ার্ড—সাহিত্যে।
- ব্যাস সম্মান—সাহিত্যে।

ভালো কথা

ঠাকুমার বুদ্ধি

সেদিন সন্ধ্যার আগে হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। ঠাকুমা বলল, আজ খেলতে যাবি না। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিলাম। আমাদের জানালায় রাখা টবে দুটো পায়রা বাসা বেঁধে ডিম দিয়েছিল। আজ সকালেই ডিম ফুটে দুটো বাচ্চা বেরিয়েছে। অসময়ে অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় পায়রা দুটো ঠাকুমার মাথায় গায়ে উড়ে উড়ে বসতে লাগলো। ঠাকুমা বুঝতে পেরে বড় ঝুড়িটি নিয়ে বাসার কাছে দাঁড়াতেই পায়রা দুটো বাসায় বসে পড়লো। ঠাকুমা সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা সমেত পায়রা দুটোকে ঢাকা দিয়ে দিল। তড়বড়িয়ে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, ঝুড়ির ওপরও শিল পড়তে লাগল। ঠাকুমা বলল— পশুপাখিরা সব বুঝতে পারে, তাই ওরকম করছিল। পরদিন সকালে ঠাকুমা ঢাকনা খুলে দেখে পরম যত্নে ছানাদুটোকে ওরা ঢেকে রেখেছে।

শ্রেয়া বর্মা, নবম শ্রেণী, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) য় উ তী ত্ত র ভা	(১) ত্রী এ প ক জ বী
(২) ক উ ন ৎ জ সা	(২) ন্ন ঐ ম্প তি হ্য স

১২ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) অকালবোধন (২) আনন্দদায়ক

১২ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) ইতিহাসবিদ (২) ঈশ্বরানুবাগী

উত্তরদাতার নাম

(১) আলাপন দলই, হলদিয়া, পূ: মেদিনীপুর। (২) প্রত্যুষা দেবনাথ, গাইঘাটা, উঃ ২৪ পরগনা। (৩) রূপষা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (৪) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

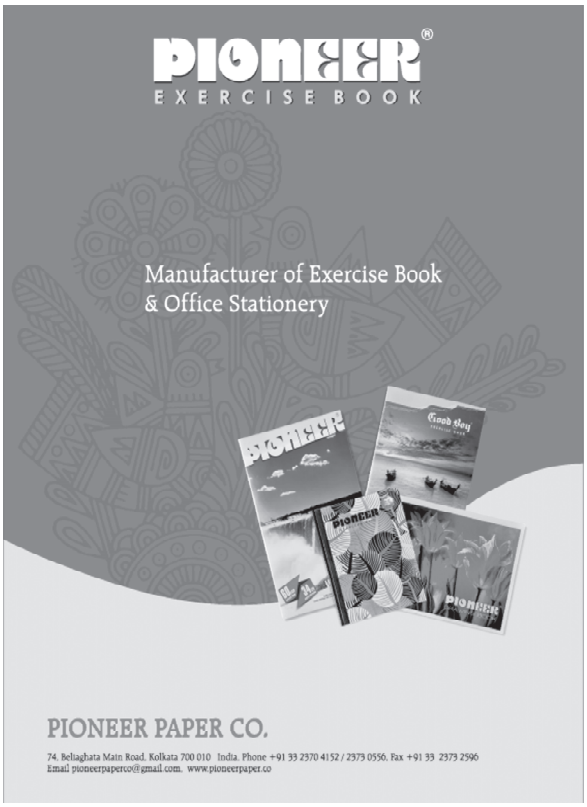

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

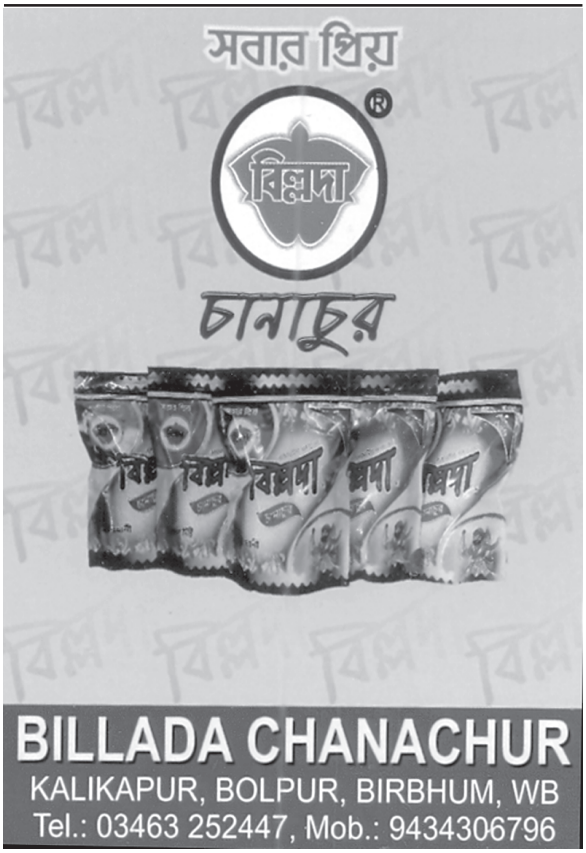

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
9 April - 2018 - Rs. 10.00

SURYA
Energising Lifestyles

LIGHTING

PIPES

Innovative
DESIGN

World-class Quality
PRODUCTS

APPLIANCES

Just One Name
SURYA

FANS

SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com | www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting | /surya_roshni

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।